মাঘ—১৩৯৫

ফেব্রুয়ারী—১৯৮৯

সন্দেশ

সম্পাদনা

লীলা মজুমদার

নলিনী দাশ

সত্যজিৎ রায়

১৩৯৬ সালের সন্দেশের দাম ও চাঁদার হার

কাগজের দাম, ডাক মাশুল এবং ছাপার ও অন্যান্যসমস্ত খরচ অনেক বেড়ে গেছে তাই আমরা বৈশাখ ১৩৯৬ থেকে সন্দেশের দাম কিছুটা বাড়াতে বাধ্য হচ্ছি। প্রতি সংখ্যা ৫.০০, শারদীয়া ২৫.০০।

বার্ষিক সডাক ৫৫.০০, শারদীয়া হাতে নিলে ৫০.০০, সব হাতে নিলে ৪৫.০০

প্রতি বাংলা মাসের মাঝামাঝি, ইংরাজী মাসের প্রথমে সন্দেশ প্রকাশিত হয় এবং Under Certificate of Posting পাঠান হয়।

ইংরেজি মাসের তৃতীয় সপ্তাহেও বই না পেলে লিখিত নালিশ জানালে ডুপ্লিকেট দেওয়া হয়।

সন্দেশের চাঁদা মানিঅর্ডারে, নগদে অথবা 'চেকে' পাঠান যায়। Sandesh নামে চেক লিখবেন, মফঃস্বলের চেক দিলে ভাঙ্গাবার খরচ আট টাকা লাগবে। পোস্টাল অর্ডার নেওয়া হয় না।

গ্রাহক-গ্রাহিকারা চিঠিপত্র, ধাঁধার উত্তর, লেখা, ছবি ইত্যাদি পাঠাবার সময়ে গ্রাহক নম্বর, নাম ঠিকানা ও বয়স স্পষ্ট করে লিখবে। সন্দেশ পাঠাবার সময়ে নামের বাঁ পাশে গ্রাহক সংখ্যা লিখে দেওয়া হয়। গ্রাহক স্কুল, ক্লাব বা লাইব্রেরির প্রতিটি ছাত্র/মেম্বার গ্রাহক। ব্যক্তিগত উত্তর চাইলে জোড়া পোস্ট কার্ড লিখতে হবে।

লেখকেরা স্বনামাঙ্কিত পোস্টকার্ড দিলে ফলাফল জানানো হবে। উপযুক্ত টিকিটযুক্ত খাম না দিলে অমনোনীত লেখা ফেরত দেওয়া হবেনা। কোন মাসে লেখা পাঠানো হয়েছিল সঠিকভাবে না জানালে ফলাফল জানানো সম্ভব নয়। আলগা টিকিট পাঠাবেন না।

হাতে নিলে পাঁচ, ডাকে নিলে পনের কপির কমে এজেন্সি দেওয়া হয় না। আমরা নিজব্যয়ে মফঃস্বল এজেন্টকে পত্রিকা পাঠাব কিন্তু ফেরত দেবার ডাক খরচ এজেন্টকে দিতে হবে। রেলে ফেরত নেওয়া হয় না। ৫-৯৯ কপিতে ২৫%, ১০০—৩৩.৩৩% কমিশন।

বিজ্ঞাপনদাতারা অনুগ্রহ করে ছয় সপ্তাহ আগে ব্লক, আর্টপুল, পাণ্ডুলিপি পাঠাবেন।

বিজ্ঞাপন প্রতিনিধি—আনন্দ ঘোষ

সন্দেশ কার্যালয়—১৭২/৩, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-২৯ ফোন: ৪৬-৪৯১৯
নিউস্ক্রিপ্টের দোকান—এ-১৪, কলেজ স্ট্রিট মার্কেট, কলিকাতা ৭০০০০৭

পাতিরাম বুক স্টল কলেজ স্ট্রীট জংশন	রবীন বর্মন টাইমস অব ইণ্ডিয়া ও হাওড়া এলাকায়	প্রশান্ত নন্দী গড়িয়াহাট বিপনি গড়িয়াহাট মোড়	অবনী দেয়াসী হাজরা মোড়
শ্যামল ভট্টাচার্য ৭৭ মহাত্মা গান্ধী রোড কলি-৯ (টেমার লেনের মুখে)	পাত্র বুক ষ্টল	রসরাজ শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট	সুশীল দত্ত শ্যামবাজার

হাওড়া, শিয়ালদহ ও অন্যান্য বড় বড় রেলওয়ে ষ্টেশনে হুইলার বুক ষ্টল

"Be Brave and all the rest follows"

Jawaharlal Nehru

This is what Jawaharlal Nehru wrote to his daughter, Indira Priyadarshini, in a letter dated Oct. 26, 1930.

Today, Republic Day, in the year that we observe the centenary of Jawaharlal Nehru, we remember his words and all those children who have shown exceptional courage, living up to the ideals of service above self.

जवाहरलाल नेहरू जन्मशती
JAWAHARLAL NEHRU CENTENARY
1889 1989

davp 88/616

ভবিষ্যৎ প্রজন্মের স্বার্থে গড়ে তুলুন দূষণমুক্ত পৃথিবী

বিভিন্ন ধরণের পরিবেশ দূষণ বর্তমান যুগে আমাদের সামনে কঠিন সমস্যার সৃষ্টি করেছে। এই পরিস্থিতি কিন্তু একদিনে তৈরি হয়নি। প্রাকৃতিক নিয়মগুলিকে অগ্রাহ্য করে মানুষ আধুনিক জীবনের ক্রমবর্ধমান ও জটিল চাহিদার সামাল দিতে নানাভাবে প্রকৃতির কাজে হস্তক্ষেপ করেছে। উন্নততর জীবনযাত্রার প্রয়োজনে মাটি, জল, অরণ্য ও খনিজ সম্পদকে অবাধে মানুষ ব্যবহার করেছে— অতিব্যবহারের ফলে যে ক্ষতি তা পূরণের ব্যবস্থা না করেই। ফলশ্রুতি হিসেবে এই গ্রহে আমাদের অস্তিত্ব আজ বিপন্ন।

অবাধ বৃক্ষচ্ছেদন কলকারখানার বর্জ্য পদার্থ ঢেলে নদীর নির্মল স্রোতকে রুদ্ধ করা, যানবাহন কারখানা থেকে নিঃসৃত বিষাক্ত গ্যাস এবং ধোঁয়া ও কর্কশ উচ্চগ্রামের শব্দ আমাদের পরিবেশ দূষণের শিকার করে তুলেছে।

কিন্তু আমরা কি সম্ভাব্য এই বিপদ সম্বন্ধে অবহিত ?

যদি এই অবস্থা চলতে থাকে তাহলে অচিরেই পৃথিবী থেকে অরণ্য লুপ্ত হয়ে যাবে, খরা এবং বন্যার কবলে পড়বে পৃথিবী, প্রাণী ও উদ্ভিদজগতের অসংখ্য প্রজাতি চিরদিনের মত বিলুপ্ত হবে, আমাদের এই সুন্দর গ্রহের বাতাস হয়ে পড়বে নিঃশ্বাস নেবার অযোগ্য। এবং এ সমস্তই ঘটবে আমাদের অপরিণামদর্শিতা লোভ ও প্রাকৃতিক সম্পদের ক্রমবর্ধমান চাহিদার জন্য।

উন্নয়নমূলক কাজকর্ম আমাদের চালিয়ে যেতে হবে। কিন্তু তা করতে হবে প্রাকৃতিক ভারসাম্যের হানি না ঘটিয়ে। নিষেধমূলক আইনের যথাযথ প্রয়োগ এবং আধুনিক প্রযুক্তিবিদ্যার সাহায্যে আমরা এই বিপদের মোকাবিলা করতে পারি।

পরিবেশ সংরক্ষণের কাজে ব্রতী হতে হবে আমাদের সকলকেই। প্রস্তুত হতে হবে দূষণমুক্ত পৃথিবী গড়ার উদ্দেশ্যে দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রামের জন্য।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

আই সি এ ৫৭৩৫/৮৮

মাঘ ১৩৯৫

সন্দেশ

ছেলেমেয়েদের সচিত্র মাসিকপত্র

ফেব্রুয়ারী ১৯৮৯

সম্পাদক

লীলা মজুমদার, নলিনী দাশ, সত্যজিৎ রায়

গল্প—

রাবণ / উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী ৮৯৬

হড়ুকবাজ সিং / উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী ৯০১

ভীতু কামা / উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী ৯০৪

চাঁদা বনাম জ্ঞান/সুভাষ বন্দ্যোপাধ্যায় ৯০৬

মালি ! সলিল চট্টোপাধ্যায় ৯০৮

৩৫৪ আপ প্যাসেঞ্জার / পরেশ দত্ত ৯২৩

সাধারণ বুদ্ধি / পলাশবরণ পাল ৯৩৩

শ্যামাকান্ত / রাধিকারঞ্জন চক্রবর্তী ৯৩৮

কমিক স্ট্রিপ—

টোটোর অ্যাডভেঞ্চার / গল্প-নলিনী দাশ, ছবি-প্রশান্ত ৯১৬

ন্যাড়া / হিজি বিজ বিজ ৯২৭ ৯৪৪

কবিতা ও ছড়া—

ক্ষতি কিছু হোক না হোক / নিখিল তরফদার ৮৯৫

দু'টো আমি / শুভশ্রী রায় ৯১৪

কাটাকুটি / তাপস রায়চৌধুরী ৯১৫

আর ভয় পায় না / সুবীর গুপ্ত ৯১৫

পথচলা / সুচিত চক্রবর্তী ৯১৫

শীত এলো / সুখেন্দু মজুমদার ৯২২

বই মেলা / আশিস কুমার মুখোপাধ্যায় ৯২২

সে এসেছে / কালিদাস ভট্টাচার্য ৯২৬

এলো কোন মেলে / চুনী দাশ ৯৩৪

ফ্রিংগে / প্রণব মুখোপাধ্যায় ৯৪৩

শিয়াল / বিশ্বপ্রিয় ৯৫২

প্রবন্ধ—

বনের খবর / প্রমদারঞ্জন রায় ৯১৮

কথাবার্তা ৯২১

মরুসুন্দরী কুয়েত / মীরা দে ৯২৮

বিশ্বের প্রথম বেলুন যাত্রী / তাপস কুমার ৯৩৫

ক্যালগারিতে শীত অলিম্পিক / ঋত্বিন হালদার ৯৫৩

পুস্তক পরিচয় / কল্যাণী কার্লেকর ৯৪২

প্রকৃতি পড়ুয়ার দপ্তর / জীবন সর্দার ৯৪৫

চিঠিপত্র ৯৪৯

ধাঁধা ও প্রতিযোগিতা ৯৫১

কালাচাঁদ বনাম পাগলা দাশু ৯৪৮

হাত পাকাবার আসর ৯৫৯

বনের খবর / প্রমদারঞ্জন রায়

সন্দেশ
ছেলেমেয়েদের সচিত্র মাসিকপত্র

মাঘ ১৩৯৫

ফেব্রুয়ারী ১৯৮৯

ক্ষতি কিছু হোক না হোক

নিখিল তরফদার

রেডিওটার নব ঘুরিয়ে
একটুখানি খুলতে গেলে
ছোটকা তেড়ে মারতে আসে
ঘুণাক্ষরে টেরটি পেলে।

টিভি-র সাথে দু'খানা তার
ঝুলে থাকা এন্টেনায়
একটুখানি হাত লাগালে
অমনি বাবা চোখ রাঙায়।

কাগজ নিয়ে আঁকলে ছবি
পিসিমণির কলম দিয়ে,
কিম্বা যদি কাটি কিছু
দাদার ছোট চাকু নিয়ে,

হারমনিয়ম বাজাই যদি
গামা-পাধা-নিসা বলে,
অথবা চুপ করে ধরি
ঠাকুরমায়ের জপের থলে,

হায় হায় হায়! গেল গেল!
আঁতকে ওঠে বাড়ির লোক,
চেঁচানোটাই স্বভাব যেন
ক্ষতি কিছু হোক না হোক।

রাবণ উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী

রাবণ একবার পশ্চিম সমুদ্রে গিয়া একটি দ্বীপে আগুনের মত তেজস্বী এক ভয়ংকর পুরুষকে দেখিল। তাঁহাকে দেখিয়াই রাবণ বলিল, 'যুদ্ধ দাও।' তারপর সে তাহাকে কত শূল, কত শক্তি কত ঋষ্টি, কত পট্টিশের ঘা মারিল, কিন্তু তাঁহার কিছুই করিতে পারিলনা। তখন সেই ভয়ংকর পুরুষ রাবণকে টিকটিকির মত দুহাতে এমনি চাপিয়া দিলেন যে তাহাতেই তাহার প্রাণ যায় যায়। তারপর তিনি তাহাকে মাটিতে ফেলিয়া পাতালে চলিয়া গেলেন।

কিঞ্চিৎ পরে রাবণ উঠিয়া রাক্ষসদিগকে জিজ্ঞাসা করিল, 'সেই ভয়ংকর লোকটা কোথায় গেল?' রাক্ষসেরা একটা গর্ত্ত দেখাইয়া বলিল, 'সে ইহারই ভিতর ঢুকিয়া গিয়াছে।' অমনি রাবণও তাড়াতাড়ি সেই গর্ত্তের ভিতর ঢুকিল। তারপর পাতালের মধ্যে খুঁজিতে খুঁজিতে এক জায়গায় গিয়া দেখিল সেই মহাপুরুষ একটা খাটের উপর ঘুমাইয়া আছেন। সেখানে গিয়া রাবণ সবে দুষ্ট ফন্দি আঁটিতেছে এমন সময় হঠাৎ সেই ভয়ংকর পুরুষ হো হো শব্দে হাসিয়া উঠিলেন, আর তাহাতেই রাবণ কানে তালা লাগিয়া মাথা ঘুরিয়া পড়িয়া গেল। তখন ভয়ংকর পুরুষ তাহাকে বলিলেন, 'আর কেন? এই বেলা চলিয়া যাও। ব্রহ্মা তোমাকে অমর হইবার বর দিয়াছেন। কাজেই তোমাকে বধ করা হইলনা।' সেই ভয়ংকর পুরুষ ছিলেন ভগবান কপিল।

আর একবার রাবণ গিয়াছিল মাহিষ্মতীর রাজা অর্জ্জুনের সহিত যুদ্ধ করিতে। মাহিষ্মতীতে গিয়া সে অর্জ্জুনের মন্ত্রীদিগকে বলিল, 'তোমাদের রাজা কোথায়? আমি তাহার সহিত যুদ্ধ করিব!' মন্ত্রীরা বলিলেন, 'তিনি বাড়ী নাই।'

এ কথায় রাবণ সেখান হইতে বিন্ধ্য পর্ব্বতে চলিয়া আসিল। বিন্ধ্য অতি সুন্দর পর্ব্বত। সেই পর্ব্বতের নীচ দিয়া নর্মদা নদী বহিতেছে, তাহার শোভা দেখিলে চক্ষু জুড়াইয়া যায়। এমন নির্মল জল, এমন শীতল বায়ু, এত রকমের ফুল আর অতি অল্প স্থানেই আছে। রাবণ মনের সুখে সে জলে নামিয়া স্নান করিল।

ঠিক সেই সময়ে সেখানে একটা ভারী আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটিতেছিল। নর্মদার জল স্বভাবতই পূর্ব্ব হইতে পশ্চিম দিকে বহিয়া থাকে, কিন্তু সেদিন দেখা গেল যে তাহা এক একবার হঠাৎ উঁচু হইয়া পশ্চিম হইতে পূর্ব্ব দিকে ফিরিয়া আসিতেছে। ইহাতে রাবণ যারপরনাই আশ্চর্য্য হইয়া শুক সারণকে বলিল, 'দেখ ত ব্যাপারটা কি।'

শুক সারণ তখনই পশ্চিম দিকে চলিয়া গেল, আর খানিক পরেই ব্যস্তভাবে ফিরিয়া আসিয়া বলিল, 'মহারাজ, প্রকাণ্ড শালগাছের মত উঁচু একটা লোক নর্মদায় নামিয়া স্নান করিতেছে। উহার এক হাজারটা হাত। সেই হাজার হাতে সে এক একবার নদীর জল আগলাইয়া ঠেলিয়া দিতেছে আর তাহাতেই সে জল এত উঁচু হইয়া ফিরিয়া আসিতেছে।

একথা শুনিয়াই রাবণ বলিয়া উঠিল 'অর্জ্জুন'! তারপর আর এক মুহূর্ত্তও বিলম্ব না করিয়া অমনি গদা ঘুরাইতে ঘুরাইতে অর্জ্জুনের সহিত যুদ্ধ করিতে চলিল। অর্জ্জুনের লোকেরা তাহাকে আটকাইতে চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু রাক্ষসেরা তাহাদিগকে মারিয়া ধরিয়া গিলিয়া খাইয়া নাকাল করিয়াছিল।

অর্জ্জুন একথা শুনিতে পাইয়াই বিশাল গদা হাতে ছুটিয়া আসিলেন। রাক্ষসেরা তাঁহাকে বাধা দিয়াছিল, কিন্তু সেই গদার সম্মুখে তাহারা কিছুতেই টিকিতে না পারিয়া শেষে ছুটিয়া পলাইল। তখন রাবণ আর্জ্জুনের যে যুদ্ধ হইল সে বড়ই ভয়ানক। দুজনেরই যেমন বিশাল দেহ, হাতে তেমনি ভীষণ গদা। রাবণ ভয়ানক তেজের সহিত অনেকক্ষণ যুদ্ধ করিয়াছিল, কিন্তু শেষে অর্জ্জুনের গদার ঘায় অস্থির হইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বসিয়া পড়িল। অর্জ্জুনও অমনি তাহাকে ধরিয়া এমনি বাঁধন বাঁধিলেন, যে সে

কথা আর বলিবার নয়। তাহা দেখিয়া দেবতাগণের কি আনন্দই হইল! তাঁহারা যে যত পারিলেন অর্জ্জুনের মাথায় পুষ্পবৃষ্টি করিলেন।

এদিকে রাক্ষসেরা আসিয়া অর্জ্জুনের হাত হইতে রাবণকে ছাড়াইয়া নিতে কত চেষ্টাই করিল, কিন্তু সে কি তাহাদের কাজ? অর্জ্জুন তাহাদিগকে বিধিমতে ঠেঙ্গাইয়া রাবণকে লইয়া ঘরে চলিয়া গেলেন।

এখন রাবণের ত আর সংকটের সীমাই নাই, এ সংকট হইতে তাহাকে কে বাঁচায়? বাঁচাইবার লোক একটিমাত্র আছেন, তিনি হইতেছেন উহার পিতামহ পুলস্তমুনি। মুনি ঠাকুর নাতির মায়া এড়াইতে না পারিয়া তাড়াতাড়ি আসিয়া অর্জ্জুনকে বলিলেন, 'বাছা, আমার নাতিটিকে ছাড়িয়া দাও। উহাকে যে সাজা দিয়াছ, তাহাতেই তোমার খুব নাম হইবে, আর উহাকে রাখিয়া লাভ কি?'

একথায় অর্জ্জুন খুসী হইয়া তখনই রাবণকে ছাড়িয়া দিলেন; সে লজ্জায় মাথা হেট করিয়া চোরের মতন সেখান হইতে চলিয়া আসিল। কিন্তু দুষ্ট লোকের লজ্জা আর কতকাল থাকে? দুদিন পরেই দেখা গেল যে, রাবণ আবার রাজাদিগকে খোঁচাইয়া ফিরিতেছে।

* * *

মুনির কথায় অর্জ্জুন রাবণকে ছাড়িয়া দিলেন, আবার তাহার সহিত বন্ধুতাও করিলেন। কাজেই তখন আর তাহার দর্পের সীমাই রইল না। যে-কোন বীরের নাম শুনিলেই সে তাহার সহিত যুদ্ধ করিতে গিয়া উপস্থিত হয়, আর তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া আকাশ ফাটাইয়া দেয়। এমনি করিয়া একদিন সে কিষ্কিন্ধায় গিয়া বড়ই তর্জ্জন গর্জ্জন করিতে লাগিল।—'বালী কোথায়? আমি তাহার সহিত যুদ্ধ করিব।'

বালী তখন বাড়ী ছিল না, সমুদ্রের ধারে সন্ধ্যা করিতে গিয়াছিল। অন্য বানরেরা রাবণকে বলিল, 'বালী সন্ধ্যা করিতে গিয়াছেন, এখনি আসিবেন। ততক্ষণে তুমি এই বিচিত্র সংসারখানি একবার শেষ দেখা দেখিয়া লও, কারণ বালী আসিলে আর তোমার প্রাণের আশা তিলমাত্রও থাকিবে না। আর যদি তোমার নিতান্তই শীঘ্র শীঘ্র মরিবার প্রয়োজন হইয়া থাকে, তবে না হয় দক্ষিণ সমুদ্রে গিয়া তাঁহাকে

খুঁজিয়াই লও।'

রাবণ তখনই বানরদিগকে বকিতে বকিতে বকিতে পুষ্পক রথ হাঁকাইয়া চলিয়া গেল, আর খানিক দূর গিয়াই দেখিল, বালী সোনার পাহাড়ের ন্যায় সমুদ্রের ধারে বসিয়া আছে, তাহার মুখখানি সকালবেলার সূর্যের মত লাল আর উজ্জ্বল দেখা যাইতেছে। রাবণ ভাবিল, 'চুপি চুপি গিয়া বানরকে হঠাৎ জাপটিয়া ধরিতে হইবে।' এই বলিয়া সে খুবই চুপি চুপি যাইতে লাগিল। সে জানে না যে, বালী ইহার আগেই তাহাকে দেখিতে পাইয়াছে, আর তাহার মনের কথাটি ঠিক বুঝিয়া লইয়া তাহারই জন্য চুপ করিয়া বসিয়া আছে—একটিবার হাতের কাছে পাইলেই তামাসাটা দেখাইয়া দিবে।

চোখে ভ্রূকুটি, মুখে খামাটি, হাত দুটি বিষম ব্যগ্রভাবে বাড়ান, এমনিভাবে আসিয়া রাবণ চোরের মত বালীর পিছনে দাঁড়াইল; ভাবিল, 'এইবার ধরি!' কিন্তু হায়! তাহার আগেই বালী তাহাকে ধরিয়া বগলে পুরিয়া ফেলিল। সে একটিবার পিছনবাগে তাকাইয়াও দেখে নাই, অথচ ঠিক ফড়িংটির মত রাক্ষসের বাছাকে ধরিয়া বগলে পুরিয়াছে। রাবণের সঙ্গের রাক্ষস-গুলি অবশ্য তখন ব্যস্ত হইয়া বালীকে মারিতে গিয়াছিল, কিন্তু বালীর আরেকটা হাত-পা-নাড়া খাইয়াই তাহারা কাঁপিয়া অস্থির, যুদ্ধ আর করিবে কি?

এদিকে রাবণ বালীর বগলে থাকিয়া প্রাণপণে তাহাকে আঁচর-কামড় দিতেছে, কিন্তু বালীর কাছে তাহা পিঁপড়ার কামড়ের মতও ঠেকিতেছে না। বালী সে সব অগ্রাহ্য করিয়া নিজের সন্ধ্যাবন্দনায় মন দিল। দক্ষিণ সাগরের সন্ধ্যা শেষ হইল, রাবণকে বগলে লইয়াই সে শূন্যপথে পশ্চিম সমুদ্রে গিয়া সন্ধ্যা করিতে লাগিল। তারপর উত্তর সমুদ্র আর পূর্ব্বে সমুদ্রেও ঠিক সেইরূপে সন্ধ্যা শেষ না করিয়া সে কিষ্কিন্ধ্যায় ফিরিলনা। ততক্ষণে সেই বগলের চাপে আর গন্ধে আর ঘামে রাবণের কি দশা হইয়াছিল, বুঝিয়া লও!

কিষ্কিন্ধ্যায় ফিরিয়া বালী রাবণকে বগল হইতে বাহির করিয়া হাসিতে হাসিতে জিজ্ঞাসা করিল। 'তুমি কোথা হইতে আসিয়াছ?' রাবণ যাতনায় মিটিমিটি চোখে বলিল, 'আমি লঙ্কার রাজা রাবণ, আপনার সঙ্গে যুদ্ধ করিতে আসিয়াছিলাম। আপনি আমাকে পশুর মত ধরিয়া এত পথ ঘুরাইয়া আনিলেন, আপনার কি আশ্চর্য্য ক্ষমতা! আমি আপনার সঙ্গে বন্ধুতা করিব।' সুতরাং তখন দুজনে বন্ধুতা হইয়া গেল। কাজেই সাজা পাইয়াও রাবণের শিক্ষা হইল না। সে আবার ব্রহ্মাণ্ডময় খুঁজিয়া বেড়াইতে লাগিল, কোন ছলে কাহারও সহিত যুদ্ধ করিয়া একটু বাহাদুরী লইতে পারে কিনা।

ঘুরিতে ঘুরিতে আবার একদিন নারদমুনির সঙ্গে রাবণের দেখা হইয়াছে। রাবণ বলিল, 'মুনি ঠাকুর, বলুন ত, কোন দেশের লোকের গায় সকলের চেয়ে বেশী জোর? তাহাদের সহিত আমি যুদ্ধ করিব!' মুনি বলিলেন 'ক্ষীরোদ সমুদ্রে শ্বেতদ্বীপ নামে একটা প্রকাণ্ড দ্বীপ আছে। সেই দ্বীপের লোকের মতন বলবান আর ধার্ম্মিক মানুষ পৃথিবীতে আর কোথাও নাই।' একথা শুনিবামাত্রই রাবণ শ্বেতদ্বীপের দিকে পুষ্পক রথ চালাইয়া দিল, মুনি ঠাকুরও একটু চিন্তা করিয়া তামাসা দেখিবার জন্য সেইখানেই চলিয়া গেলেন।

তারপর রাক্ষসেরা ত সিংহনাদ করিতে করিতে শ্বেতদ্বীপে গিয়া উপস্থিত হইয়াছে, কিন্তু সে স্থানের এমনি তেজ যে, তাহারা কিছুতেই সেখানে টিকিয়া থাকিতে পারিতেছে না। হাওয়ায় পুষ্পক রথ উড়াইয়া নিল, রাক্ষসেরা সকলে ভয়ে পলায়ন করিল। কাজেই তখন রাবণ আর কি করে? সে রথ আর লোকজন সব ছাড়িয়া দিয়া নিজেই গিয়া দ্বীপের ভিতরে প্রবেশ করিল।

সেখানে কয়েকটি মেয়ে বেড়াইতেছিল। তাহারা দেখিল, দশ মাথা আর কুড়ি হাতওয়ালা

রাবণের দুর্দশা—ছবি, সুকুমার রায়

একটি লোক পথ দিয়া যাইতেছে, আর প্রাণপণে নিজের চেহারাটাকে ভয়ঙ্কর করিবার চেষ্টা করিতেছে। এসব দেখিয়া তাহাদের বড়ই হাসি পাওয়ায় তাহাদের একজন আসিয়া রাবণের হাত ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'তুমি কে বাপু? তোমার বাবার নাম কি? এখানে আসিয়াছ কি করিতে?' এ-কথায় রাবণের একটু রাগ হইল। সে খুব গম্ভীর সুরে উত্তর দিল, 'আমি বিশ্রবার পুত্র রাবণ। এখানে যুদ্ধ করিতে আসিয়াছি। কাহাকেও দেখিতে পাইতেছিনা!'

শুনিয়া মেয়েরা সকলে খিলখিল করিরা হাসিতে লাগিল। তারপর তাহাদের একজন এক হাতে রাবণের কোমর ধরিয়া, অন্য মেয়েদের সামনে নিয়া তাহাকে ঘুরাইতে বলিল, দেখ দেখ, আমি কেমন একটী কালো পোকা ধরিয়াছি; এর আবার দশটা মাথা। কুড়িটা হাত!' বলিয়াই সে সেটা আর একজনকে ছুঁড়িয়া দিল। সে আবার দিল আরেকজনের হাতে ছুঁড়িয়া। তখন ত রাবণকে লইয়া খুবই একটা লোফালুফির ধুম পড়িয়া ধুম পড়িয়া গেল! মেয়েদের তাহাতে আমোদের সীমাই নাই, কিন্তু রাবণ বেচারার প্রাণ লইয়া টানাটানি! কাজেই তখন সে আর কি করে? সে দশ মুখের তিনশত বিশদাঁতে 'কট্রাশ' করিয়া এক মেয়ের হাতে এক কামড় বসাইয়া দিল। সে মেয়ে ত তখনই 'মা-া-া-া গেগা-া-া-া' বলিয়া তাহাকে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া প্রাণপণে হাত ঝাড়িতে লাগিল। ততক্ষণে আরেকটি মেয়ে তাহাকে ধরিয়া শূন্যে লইয়া গিয়াছিল, তাহার হাতে সে দিল ভয়ানক আঁচড়াইয়া! সে মেয়েটি তখন তাড়াতাড়ি তাহাকে ছুঁড়িয়া একেবারে সমুদ্রের মাঝখানে ফেলিয়া দিল।

নারদমুনি অবশ্য এতক্ষণ সেইখানে দাঁড়াইয়া তামাসা দেখিতে ছিলেন। আর আনন্দে অস্থির হইয়া কেবলই হো-হো শব্দে হাস্য আর করতালি দিয়া নৃত্য করিতেছিলেন।

বলা বাহুল্য, রাবণের যুদ্ধের সাধ সেদিন সেই সমুদ্রের জল খাইয়াই মিটিয়াছিল।

একালের বাচ্চাদের জন্য
সেকালের রূপকথা
তেপান্তর পার হয়ে—১৫ টাকা
কথক ঃ দেবব্রত ঘোষ
রেখাচিত্র ঃ রামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়

ছোটদের জন্য আরও কিছু বই
* রামছাগলের মেটে ৪ টাকা
* তারায় ভরা ছায়াপথ ৪ টাকা
* সাদার মধ্যে সাতটা রং ৪ টাকা
* টক্‌কা টক্‌কা টরে টরে ৪ টাকা
* আমার বন্ধু মাংশু ১০ টাকা
এন্ পি সেলস্ (প্রাঃ) লিমিটেড
১০৮ বিবেকানন্দ রোড
কলিকাতা-৭০০০০৬

"দ্রোণফুল লেগে আছে মেরুণ—শাড়িতে তার,
নিম—আমলকি পাতা হালকা বাতাসে
চুলের উপরে উড়ে উড়ে পড়ে........"
..... জীবনানন্দ দাস
তন্তুশ্রী
বালুচরী, টাঙ্গাইল, শান্তিপুরী, পলিকট শাড়ী
এ ছাড়াও
তাঁত ও ছাপা বেডসীট ও বেড কভার
রং—বেরঙের কম্বল
ওয়েস্ট বেঙ্গল হ্যাণ্ডলুম এণ্ড পাওয়ারলুম
ডেভেলপমেণ্ট কর্পোরেশন লিমিটেড
(পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারের সংস্থা)
৬এ, রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার (৭ম তল)
কলিকাতা-৭০০০১৩

হুড়ুকবাজ সিং

উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী

এক রাজার ছিল দুই পালোয়ান, 'দুড়ুম-পটাশ সিং' আর 'হুড়ুকবাজ সিং।'

দুড়ুমপটাশ সিং সাড়ে পাঁচ হাত লম্বা, আর জোয়ানও তেমনি। সে একদিন রাজার আস্তাবলে হেঁচে ফেলেছিল, সেই হাঁচির চোটে রাজার পক্ষীরাজ ঘোড়া পাঁচ মাইল দূরে ঠিকরে পড়ে মারা গেল।

হুড়ুকবাজ সিং ছিল মোটে তিন হাত লম্বা, কিন্তু তার মাথার পাগড়ীটা ছিল সাত হাত উঁচু, আর তার বর্শাখানি ছিল একটি আস্ত বাঁশ। আর সে কথা কইত ভারী লম্বা চওড়া। আর আর পালোয়ানেরা বলছিল, তারা ভারী ভারী জোয়ানের সঙ্গে কুস্তী লড়েছে, তা শুনে অমনি হুড়ুকবাজ বলে উঠল, "মানুষের সঙ্গে কুস্তী লড়া

ত ভারী একটা কথা। তোরা কেউ ভূতের সঙ্গে কুস্তী লড়েছিস ?"

পালোয়ানেরা তা শুনে বড়ই বোকা বনে গেল, তাদের কেউ কখনো ভূতের সঙ্গে কুস্তী লড়েনি! তা শুনে হুড়ুকবাজ বল্ল, তবে শোন্—

"আগে আমি ছ হাত উঁচু এয়া বড় জোয়ান ছিলাম। তখন বাঘের লেজ ধরে ঘুরিয়ে আছাড় মেরেছি, আর লাথি মেরে হাতী তাড়িয়েছি। পালোয়ানেরা কেউ আমার সঙ্গে লড়তে চাইত না, বাঘ ভালুক আমায় দেখলেই ছুটে পালাত। আমি দেশে বিদেশে কত জায়গায় ঘুরে বেড়ালাম ; যেখানে যাই, সব পালোয়ান ভাগে, —আমি খালি বলি 'কার সাথে লড়ব ?' শেষে শিরখুল্লাদের (যাদের মাথা খালি, অর্থাৎ বাঙ্গালী) দেশে একজন বল্ল, 'লড়তে চাও ? ঐ কালীমাঈর মন্দিরে রাত্রে যেয়ো, তাহলেই লড়তে পাবে।' আমি কি তাতে ডরাই ? ঠিক সেই রাত্রেই আমি গিয়ে সেখানে হাজির। গিয়ে দেখি সেখানে মস্ত এক ভূত বসে আছে, তার টেড়া টেড়া (বাঁকা বাঁকা) পা, বড় বড় কান আর লাল লাল সাড়ে তিনটা চোখ! সেটা আমায় দেখেই খেঁকিয়ে এল, আমিও অমনি তাল ঠুকে তার সঙ্গে লড়াই দিলাম। সে লড়াই চল্ল সতের দিন সতের রাত, তারপর ভূতের পুত কেঁউ কেঁউ করে ভেগে গেল। কিন্তু বেটা কি ভারীই ছিল! তার চাপনে আমি ছ হাত জোয়ান তিন হাত হয়ে গেলাম।"

একথা শুনে ত পালোয়ানদের ভারী তাক লেগে গেল ; তখন থেকে তারা হুড়ুকবাজ সিংকে বড্ডই মানে। এর মধ্যে হয়েছে কি, পাঠান বাদশার মুলুক থেকে "ঝুর্‌রল হুল্লোড় খাঁ" বলে এক পালোয়ান এসেছে, সে সকালে উঠে সতের সের দই আর এগার সের পেঁড়া দিয়ে জল খায়! সে এসেই রাজাকে সেলাম ঠুকে বল্ল, "আপনার পালোয়ানদের সাথে লড়াই করব।"

রাজার কুস্তীগিরদের সর্দার ছিল দুড়ুমপটাশ সিং ; লড়তে হলে সেই আগে ঝুররল হুল্লোড় খাঁর সঙ্গে লড়বে। দুড়ুমপটাশ সিং কিন্তু খাঁ সাহেবকে দেখেই বিকট মুখ সিটকিয়ে দু হাতে পেট চেপে ধরে মাটিতে গড়াগড়ি দিতে লাগল, বল্ল, "উঃ, উঃ! আমার পেটে বড্ড দরদ হয়েছে!" সকাল গেল, দুপুর গেল, বিকাল গেল, তবু দুড়ুমপটাশের পেটের দরদ সারেই না।

রাজা বল্লেন, "আমার মান ত যায় যায়, শীগগির আর কাউকে ডাক।" তা শুনে সবাই বল্ল, "মহারাজ! হুড়ুকবাজ সিং আছে বেজায় জোয়ান, তাকে ডাকুন।" অমনি হুড়ুকবাজকে ডেকে আনা হল ; রাজা তাকে বল্লেন, "এই পাঠানের সঙ্গে তোমাকে লড়তে হবে।"

হুড়ুকবাজ বল্লে, "এ আর কি বেশী কথা, কাল সকালেই আমি লড়ব। আজ আমার বরত (ব্রত) আছে, মুসলমানকে ছুঁলে নষ্ট হবে।"

রাজা বল্লেন, "সেই বেশ ; কালকে লড়াই হবে।"

তারপর রাজার কাছ থেকে ঘরে এসেই হুড়ুকবাজ বল্ল, "বাপ রে! আর না ; এই বেলা পালাই। ও বেটার সঙ্গে লড়তে গেলে আমাকে দু আঙুলে ধরে তক্ষুণি নস্যি করে ফেলবে।" বলে, চুপি চুপি ঘোড়ায় চড়ে কসে চাবুক মেরে চম্পট।

সেই ঘোড়া তাকে নিয়ে গিয়ে থামল এক মন্দিরের সামনে। সেই মন্দিরে বাবা চিলমতোড় বলে বড় ভারী এক সন্ন্যাসী থাকতেন, হুড়ুকবাজ তাঁর সামনে গিয়েই লম্বা হয়ে মাটিতে পড়ে মস্ত এক প্রণাম করে ফেল্ল।

সন্ন্যাসী তাতে যারপরনাই খুসী হয়ে বল্লেন, "তুই কি চাস বাপু ?" হুড়ুকবাজ বল্ল, "বাবা, এক পালোয়ানের ভয়ে দেশ ছেড়ে পালিয়ে এসেছি। যদি বাবা দয়া করেন, তবে তাকে গিয়ে হারাই।" সন্ন্যাসী বললেন, "আচ্ছা তুই ফিরে যা। তুই যখন লড়বি, আমি নিজে তোর হয়ে "পহিলী হাঁথ" মারব।"

"পহিলী হাঁথ" মানে প্রথম যে থাপ্পড়টা

মারবে সেইটে। হুড়ুকবাজ সন্ন্যাসীর কথা শুনে খুসী হয়ে সেই রাত্রেই ফিরে এল।

তারপর সকাল বেলায় ত কুস্তী আরম্ভ হয়েছে। হুড়ুকবাজের মনে এখন খুবই ভরসা, সে জানে সন্ন্যাসী তার হয়ে 'পহিলী হাঁথ' মারবে। পাঠান পালোয়ান ভাল করে তার সামনে আসতে না আসতেই অমনি সে 'জয় বাবা চিলম তোড়!' বলে লাফিয়ে উঠে তার ঘাড়ে এক 'রদ্দা' (থাপ্পড়) বসিয়েছে। সে কি যে সে রদ্দা? স্বয়ং বাবা চিলমতোড় তাতে জোর দিয়েছিলেন। তার চোটে পাঠান বেচারা সাতষট্টি পাক ঘুরে, তেতাল্লিশটা ডিগবাজী খেয়ে, রাজা প্রজা সবাইকে উল্টিয়ে ঠিকরে ভিড়ের বাইরে গিয়ে পড়ে, দাঁতে দাঁত লেগে মুর্চ্ছা গেল। তারপর সে অনেক কষ্টে সেখান থেকে উঠে সেই যে ছুট দিল, আর নিজের দেশে না গিয়ে থামল না।

তখন ত আর হুড়ুকবাজের আদরের সীমাই রহিল না, রাজা সেইখানেই তাকে সেনাপতি করে দিলেন। আরো ঢের বেশি দিন বেঁচে থাকলে হয় ত সে রাজার মেয়ে বিয়ে করতেও পারত, কিন্তু সেটি আর বেচারার কপালে ঘটল না।

একদিন রাত্রে রাজবাড়ী থেকে বেরুতে গিয়ে অন্ধকারে না দেখতে পেয়ে হুড়ুকবাজ এক বেড়ালের ল্যাজ মাড়িয়ে দেয়, তাতে বেড়াল রেগে চোঁ বোঁ করে তাকে তিন চড় লাগায়। তা খেয়ে দু দিনের ভিতরে সে মরে গেল।

মরবার আগে সকলে জিজ্ঞেস করল যে, "বেড়ালটাকে এক চড় দিয়ে মেরে ফেল্লে না কেন?" তাতে হুড়ুকবাজ বল্ল,

"শের মারা থাপ্পড় সে ময় ফির হাথীকা
তোড়া দাঁত,
অওর ভগায়া মিঞা হুল্লোড় খাঁকো
মারকে এক হি হাঁথ।
লড়া বঙ্গাল মুল্কমে যাকর ভূত সে
সত্রাহ দিন'
অওর লড়াইমে মারা এৎনা আদমী,
কোই ন সকে গিন।
সারে জনম ভর কিয়া ময়নে প্যোহলেয়ানি
অ্যায়সে,
অব বিল্লী মারকে নাম বদনামী বোল
ময় করুঁ ক্যায়সে?"

অর্থাৎ

"ভেঙেছি বুনো হাতীর দাঁত আর বাঘ
মেরেছি চড়ে,
তাড়িয়েছে মিঞা হুল্লোড় খাঁকে
একটিই থাপ্পড়ে।
হারল ল'ড়ে বাংলা দেশের ভূত,
সতেরো দিন অন্তে,
আর মেরেছি যুদ্ধে এত লোক যে
কেউ পারেনি গুনতে।
করে এমনতর পালোয়ানি
সারা জনম ধরে,
বল শেষে বেড়াল মেরে নামটা খারাপ
করি কেমন করে?"

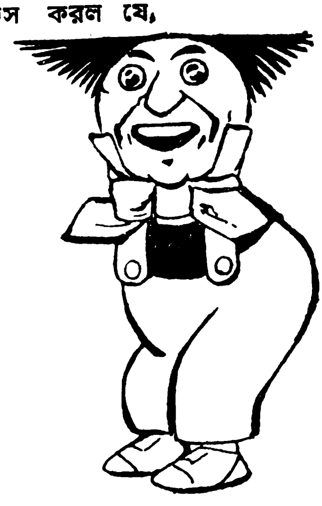

ভীতু কামা

উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী

(জুলু দেশের গল্প)

এক যে ছিল ছোট ছেলে, তার নাম ছিল কামা। সে এতটুকু মানুষ ছিল, তার পেটটি ছিল বড়, আর হাত পা ছিল কাঠি কাঠি। সে আর ছেলেদের সঙ্গে জোরে পার্‌ত না, খেলতে গেলে খালি তাদের হাতে মার খেত। বেচারা চুপ করে সে সব সয়ে থাক্‌ত; তার গায় জোর ছিল না, কাজেই কি নিয়ে ঝগড়া কর্‌বে? তার ইচ্ছা হত যে সে খুব ভারি ভারি কাজ করে, খালি গায়ে জোর ছিল না বলে সে কিছু কর্‌তে পার্‌ত না।

গ্রামের লোকেরা তাকে বল্‌ত 'ভীতু' কামা! তারা চাইত যে গ্রামের ছেলে-পিলে খুব ষণ্ডা আর সাহসী হয়। তাদের সর্দ্দার যখন দেখল যে কামা তার কিছুই হচ্ছে না তখন সে তাকে গ্রাম থেকে তাড়িয়ে দিল।

কামা ভাব্‌ল, "ওমা! কি হবে? আমি কোথায় যাব? গ্রাম থেকে ত আমাকে তাড়িয়ে দিয়েছে, এখন পরীর পাহাড়ে গিয়ে দেখি, পরীরা কি করে।"

সে দেশে একটা গোলপানা পাহাড় ছিল, তাতে পরীরা থাক্‌ত। সেখানকার লোকেরা তাদের ভয়ে কেউ সে পাহাড়ে যেত না। কামা ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে সেই পরীর পাহাড়ে গিয়ে উপস্থিত হল, আর অমনি ক্ষুদে ক্ষুদে কালো সব পরী এসে তাকে ঘিরে ফেল্ল। তারা জুলু দেশের পরী কিনা, তাই কালো; তাদের ফড়িঙের মত ডানা, আর হাতে ঢাল আর বর্ষা। কামাকে তাদের পাহাড়ে আস্‌তে দেখে তারা এমনি চটেছে যে কি আর বল্‌ব। তাদের রাজা এসে তাকে বল্ল, "তুই যে আমাদের পাহাড়ে এলি? দাঁড়া এখনি তোকে মেরে ফেল্‌ছি।"

কামা কাঁপতে কাঁপতে হাত যোড় করে বল্ল, "দোহাই রাজা মশাই, আমাকে মার্‌বেন না। আমি ভীতু কামা; আপনাদের কোন ক্ষতি করবার ক্ষমতা আমার নাই, আমাকে মেরে কি হবে?"

পরীর রাজা বল্ল, "বটে? তুই ভীতু কামা? হাঁ হাঁ, তোর কথা শুনেছি বটে। তোর গায় জোর নাই, কিন্তু তোর মনটাতে সাহস আছে। আচ্ছা বাছা, তোর আর অমনি করে ভয়ে কাঁপতে হবে না, আমি তোকে পালোয়ান করে দিচ্ছি।"

বলে পরীর রাজা মাটিতে একটা সিংহের চামড়া বিছিয়ে কামাকে বল্ল, "এর উপর শুয়ে একটু ঘুমো দেখি।"

কামা সেই সিংহের চামড়ার উপরে ঘুমিয়ে পড়্‌ল। তারপর যখন তার ঘুম ভেঙেছে, তখন সে দেখে, তার আর সেই কাঠি কাঠি হাত পা নাই, সে ভারী এক পালোয়ান হয়ে গেছে, আর তার মনে হচ্ছে যেন সে এক থাপড়ে হাতী মেরে ফেল্‌তে পারে।

যখন কামা চারদিকে চেয়ে দেখ্‌লে যে সেই পাহাড়ের উপর সে একলাটি দাঁড়িয়ে আছে। পরীদের একজনও সেখানে নাই, তারা তার জন্য মস্ত বড় ঢাল আর বর্ষা রেখে কোথায় চলে গিয়েছে।

সেই ঢাল আর বর্ষা হাতে করে কামা পাহাড় থেকে নেমে তার ঘরের দিক চল্ল। খানিক দূর এসে দেখ্‌ল যে ভয়ংকর একটা সিংহ হাঁ করে তাকে খেতে আস্‌ছে। সে কি আর এখন সিংহকে ডরায়? তার বর্ষার এক খোঁচা খেয়েই সেই সিংহ জিব বার করে চোখ উল্টিয়ে মরে গেল।

সেই সিংহটাকে কাঁধে ফেলে, ঢাল আর বর্ষা হাতে যখন কামা গ্রামে এসে উপস্থিত

হয়েছে, তখন ত তাকে দেখে আর কারুর মুখ দিয়ে কথা বেরুচ্ছে না। গ্রামের জোয়ানেরা এসে তার ঢাল আর সিংহটাকে নিয়ে কত টানাটানি কর্‌ল, কিন্তু কেউ তাকে একটু নাড়াতেও পার্‌ল না।

গ্রামের সর্দ্দার আগে কামাকে তাড়িয়ে দিয়েছিল, এখন সে তাকে কি করে আদর দেখাবে, তাই ভেবে ঠিক করতে পারছে না। তখনি সে তাকে একখানি চমৎকার ঘর আর অনেকগুলি ষাঁড় দিয়ে দিল।

এখন আর কামার কোন দুঃখ নাই। সে সেই ঘরখানিতে তার মাকে নিয়ে থাকে। আগে যারা তাকে বল্‌ত 'ভীতু' কামা, এখন তারা বলে কামা 'পালোয়ান'।

চাঁদা কষ্টে জ্ঞান

সুভাষ বন্দ্যোপাধ্যায়

একুশের তিন বনমালী মিত্র লেনটা যেখানে বড় রাস্তায় মিশেছে সেখানেই হলদে রঙের দোতলা বাড়িটায় থাকেন নরহরি সামন্ত। ভদ্রলোকের বয়স ষাটের কোঠায়, তবে চেহারা এখনও যথেষ্ট মজবুত। মাথায় টাক পড়েনি। চোখে চশমাও ওঠেনি। নরহরি বাবু রোজ সকালে তাঁর প্রিয় ডোবারম্যান কুকুরটিকে সঙ্গে নিয়ে লেকের ধারে বেড়াতে যান। এমনিতে নরহরি বাবু যথেষ্ট মিশুকে হলেও কোন এক অজানা কারণে তাঁর বিশেষ বন্ধুবান্ধব নেই। নিন্দুকে বলে ফাঁক পেলেই নাকি নরহরি বাবু লোককে জ্ঞান দেন। অযাচিত জ্ঞান হজম করার ভয়েই লোক তাঁর কাছাকাছি ঘেঁসে না। এমনকি গত বারে ঐ একই ভয়ে আমরা কেউই নরহরি সামন্তর বাড়ি সরস্বতী পুজোর চাঁদা চাইতেও যাইনি।

সে যাই হোক এবার কি করা যায়, তাই নিয়েই গতকাল আমাদের আলোচনা হচ্ছিল ক্লাবে। অনেক রাত অবধি তর্কবিতর্কের পর যদিও বা ঠিক হয়েছিল যে চাঁদা চাইতে যাওয়া হবে ; কিন্তু কে যাবে তা আর কিছুতেই ঠিক হচ্ছিল না। কেউই যেতে রাজি নয় কারণ জ্ঞান হজম করতে হবে। শেষ অবধি আমাদের ক্লাবের কোষাধ্যক্ষ টুবাইকে এক রকম জোর করেই ওখানে পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল।

বিকেলবেলা আমরা সবাই ক্লাবের সামনের মাঠটায় ক্রিকেট পেটাচ্ছি টুবাই ব্যাজার মুখ করে ক্লাবে ঢুকল, সুমিত টুবাইকে দেখে হাত ইশারায় কাছে ডাকল। আমরাও ততক্ষণে সেখানে পৌছে গেছি। টুবাই আমাদের সবার ওপর চোখ বুলিয়ে নিয়ে বলল, 'এই কান মুলছি আমি আর তোদের কোষাধ্যক্ষ থাকছি না।'

'কেন কেন' সবাই সমস্বরে শুধোলাম তাঁকে।

'কেন আবার। তোদের কথায় আজ নরহরি সামন্তর কাছে গিয়েছিলাম। প্রথমে তো বাড়িতে ঢুকতেই পারছিলাম না। একটা বিদঘুটে কুকুর এমন চেঁচানি লাগিয়েছিল না যে কি বলব। শেষে বুড়ো নিজে এসে কুকুরটাকে থামিয়ে বলল, কি চাই ভাই ?' বললাম-চাঁদার কথা। নরহরি বাবু হাঁ হাঁ করে হেসে উঠে বললেন—'ভেতরে এস।' ভিতরে যেতেই তিনি প্রশ্ন করলেন, 'তোমার নাম কি খোকা ?' নাম বললাম।

তিনি শুধুলেন—'কিসের চাঁদা।'

বললাম—'সরস্বতী পুজোর।'

'যেই না একথা শোনা অমনি ভদ্রলোক-একটার পর একটা থান ইঁটের মতন প্রশ্ন এমন ছুঁড়তে লাগলেন যে আমার একেবারে নাজেহাল অবস্থা। শেষে প্রাণ বাঁচাতে চাঁদা না নিয়েই দে ছুট।'—কি প্রশ্ন করেছিল আমরা শুধোলাম টুবাইকে।

উত্তরে টুবাই গড় গড় করে প্রশ্নগুলো মুখস্থ বলে দিল। শুনে আমাদেরই মাথা ঘুরতে শুরু করল। সে অবস্থা কাটিয়ে উঠে শেষে ঠিক হল আগামীকাল বিকালে আবার নরহরি বাবুর বাড়ি যাওয়া হবে। তবে একা একা নয়, দল বেঁধে।

পরদিন বিকালে আমরা চারজনে হাজির

হলাম নরহরি বাবুর বাড়ি। তিনি বাড়িতেই ছিলেন। টুবাইসহ আমাদের দেখে বললেন 'কি ব্যাপার আজ আবার চাঁদা নিতে এসেছ বুঝি?'

বললাম—'হ্যাঁ!'

'তা বেশ করেছ। ভেতরে এস।'

আমরা ভেতরে গিয়ে বসতেই নরহয়ি বাবু দুম করে একটা প্রশ্ন ছুঁড়লেন আমাদের দিকে 'সরস্বতী পুজোর চাঁদা তো নিতে এসেছি। বল তো সরস্বতী আসলে কে ছিলেন?'

এর উত্তর আমাদের জানা ছিল না। ফলে সবাই হাঁ করে তাকালাম তাঁর দিকে।

নরহরি বাবু বলতে শুরু করলেন—'সরস্বতীর পরিচয় দিতে গিয়ে প্রথমেই আমাদের তাঁকে শিবঠাকুরের মেয়ে বলে মনে পড়লেও তোমরা যদি বেদের যুগে উঁকি দাও তবে দেখবে সেখানে সরস্বতীর পরিচয় নদী হিসেবে। বেদের যুগ থেকে সরাসরি ঋকবেদের পাতা ওল্টালে সেখানে আবার সরস্বতীকে দেখবে ইন্দ্র, মরুৎ প্রভৃতি দেবতাদের সঙ্গে যুক্ত অবস্থায়। এখন তোমরা প্রশ্ন করতে পার দেবী আবার নদী হল কি করে। সাধারণতঃ যা কিছু বা যিনি আমাদের উপকার করেন আমরা তাঁরই ওপর দেবত্ব আরোপ করে তাঁকে শ্রদ্ধা করতে শুরু করি। নদী জমিকে শ্রীদান করে আমাদের বেঁচে থাকার জন্য খাদ্য শস্য উৎপাদনে সাহায্য করে। তার এই উপকারের জন্যই আমরা নদীতে দেবত্ব আরোপ করি। নদী যেহেতু স্ত্রীলিঙ্গ সেজন্য নদী দেব না হয়ে হল দেবী। সরস্বতীও তাই নদী হিসাবে হলেন দেবী।

আবার দেবী সরস্বতীকে আমরা বাগদেবী হিসাবেও কল্পনা করি। 'অমর কোষ' নামক বইয়ে সরস্বতীর প্রতিশব্দ হল—ভারতী, ভাষা, বাণী। শব্দের সমষ্টিই ভাষা এবং শব্দই ব্রহ্মা, একথা আমরা পাই উপনিষদে। ব্রহ্মার লিঙ্গান্তর ঘটলে হয় ব্রাহ্মী। সরস্বতী এই অর্থে হলেন বাকদেবী। বাকদেবী বলেই তাঁর হাতে থাকে বই। তাছাড়া সরস্বতী যেহেতু—'বেদ, বেদাস, বেদান্ত, বিদ্যা স্থানরূপ তাই তাঁর হাতে থাকে বীণা। সরস্বতীর মূল উৎস যেহেতু জল সেহেতু তাঁর বাহন হাঁস আর আসন পদ্ম ফুল।'

নরহরির বাবুর কথাবার্তা শুনতে শুনতে আমাদের অবস্থা ক্রমশঃ করুণ হয়ে উঠছিল।

পালিয়ে আসারও রাস্তা নেই কারণ গেট বন্ধ, তাছাড়া ডোবারম্যান কুকুরটা ছাড়া। অগত্যা বাধ্য হয়েই আমাদের অযাচিত জ্ঞান হজম করতে হল।

নরহরি বাবু একটু থেমে আবার প্রশ্ন করলেন 'আচ্ছা বলতো আগে কি সরস্বতীর মূর্তি গড়ে পুজো হত?'

টুবাই ছাড়া পাবার জন্য নাছোড়বান্দা। সে উত্তর দিল 'হত বই কি, নাহলে···' তাকে কথা শেষ করতে না দিয়েই নরহরি বাবু বললেন 'উঁহু হল না। আগে সরস্বতীর মূর্তি গড়ে পুজো মোটেই হত না। পরিবর্তে বই, দোয়াত, খাগের কলম এসবই পুজো হত। প্রথম প্রতিমা পুজোর প্রচলন হয় উনবিংশ শতকে। তবে তখন সেটা হত প্রধানত বড় লোকদের বাড়িতেই। যেমন বর্ধমানের মহারাজের সরস্বতী পুজোয় খুব ধূম হত। পাঁচ সাত ক্রোশ দূর থেকে লোকে পুজো দেখতে আসত। তারা বাজি পোড়ানো, ভাসান, সবকিছু গভীর আগ্রহে দেখত। তোমরা এই যে চাঁদা তুলছ পুজো করার জন্য এই পুজোর শুরু হয়েছিল পঁয়ষট্টি সত্তর বছর আগে।'

নরহরি বাবু একটু থেকে থেমে বাউন্সারের মতন প্রশ্ন ছুঁড়লেন আমাদের দিকে। 'বলতো আমরা এখন সরস্বতীর যে মূর্তি দেখি আগেকার দিনে কি এই মূর্তিরই পুজো হত?'

উত্তর না দেওয়াই তাড়াতাড়ি ছাড়া পাবার উপায় চিন্তা করে আমরা চুপচাপই থাকলাম।

নরহরি বাবু আমাদের মুখগুলোর দিকে এক পলক দেখে নিয়ে বললেন— তোমরা দেখছি কিছুই জানো না। তবে শোন। দেবী সরস্বতীর বর্তমানে যে মূর্তি আমরা দেখি সেটা নানা পরিবর্তনের ফল। দু একটা উদাহরণ দিই, কালিকা পুরাণে—সরস্বতীর হাতে আছে মালা ও কমণ্ডলু। অগ্নিপুরাণে—সরস্বতীর চার হাত। উপপুরাণ বৃহদ্ধর্মে—সরস্বতীর তিন চোখ আর কপালে আধখানা চাঁদ আঁকা। মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে সরস্বতীর আবার চার হাত। তাছাড়া সেখানে দেবীর সঙ্গে শুক শিশুর কথাও বলা আছে, যা আর অন্য কোথাও পাওয়া যায় না। সেখানে বলা আছে –

'শিরে শোভে ইন্দু কলা
করে শোভে জপ মালা
শুকশিশু শোভে বাম করে।'

তাহলেই বুঝতে পারছ বর্তমানে আমরা যে মূর্তি দেখি তা নানান পরিবর্তনের ফসল।'

একটু থেমে একটিপ নস্যি নিয়ে নরহরি বাবু বললেন 'থাকগে ওসব তত্ত্ব ও তথ্যের কচকচি বাদ দিয়ে আমরা এ যুগে ফিরে এসে কি দেখছি। প্রতিবারে মাঘ মাসের পঞ্চমী তিথিতে বিদ্যার দেবী সরস্বতীর পুজো হয়। আর আমরা সবাই, যবশীষ, আমের মুকুল, বাসক ফুল, দ্রোন ফুল ও বেল পাতা নিয়ে তাঁর কাছে অঞ্জলি দিয়ে বলি দেখ মা আসছে বছর যেন ভালভাবে পাশ করি।'

নরহরি বাবু থামতেই সুব্রত মরীয়া হয়ে বলে উঠল 'দাদু ওসব থাক। চাঁদাটা দিয়ে দিন আমরা বাড়ি পালাই।'

'তোমাদের চাঁদা আমার পকেটেই আছে। এই নাও সোয়া পাঁচ আনা। মায়ের পুজোয় এই দিতে হয়।' এতক্ষণ জ্ঞান হজম করে আমাদের এমনিতেই বদহজম হচ্ছিল। এবার নরহরি বাবুর কথা শুনে আমরা রীতিমতন অসুস্থ বোধ করতে শুরু করলাম।

চণ্ডী মন্দিরে সিঁদুর শাঁখার দোকান'

লাল ধুলোর যে রাস্তাটা বনজারী থেকে বৃন্দামল হয়ে শাল জংগলের মধ্য দিয়ে এঁকে বেঁকে ঝাড়সুগুড়ার দিকে চলে গেছে। শহর থেকে প্রায় দু কিলোমিটার আগে সরু একটা পাহাড়ি নদীর বালি জল পার হয়ে—এর ধারেই সেই চণ্ডী মন্দির। এই যে নদীটা—যার জলে গন্ধকের উগ্র গন্ধ বাতাসকে ভারি করে রাখে তার উঁচু পাহাড়ের ওপরে এই রাস্তারই পাশে এই মন্দির। নদীর ওপর এখানকার শ্মশান। শ্মশান হলেও চণ্ডী মন্দিরের জন্যই এই জায়গাটার নাম। চণ্ডী মন্দিরের মেলা বিখ্যাত এই এলাকায়। ঝাড়সুগুড়া থেকে বৃন্দামল এই

মালি

সলিল চট্টোপাধ্যায়

ছয় কিলোমিটার রাস্তায় এই মন্দির ও তার আশে-পাশের কয়েকটা খড় মাটির ঘরই এ পথের একমাত্র জন বসতি।

মন্দিরের চাতালে একটা গভীর কুয়ো - তার জলে সব রকম অসুখ সেরে যায়—এরকম একটা বিশ্বাসও এদিকে প্রচলিত। জলটার রঙ যেন দুধ মেশান, ঠাণ্ডা আর খেতেও ভাল। গরমের দিনে যখন পাথর ফাটা রোদ—চারদিকে 'লু' বইতে থাকে, এ পথের যাত্রীরা প্রায়ই বাইরের জাম গাছটার নিচে সাইকেল বা গরুর গাড়ি রেখে—এই জল পেট ভরে খেয়ে নাটমন্দিরের ঠাণ্ডা ছায়ায় দু দণ্ড বিশ্রাম করে যায়। মন্দিরের চাতাল ঘিরে শ্যাওলা ধরা পাথরের দেয়াল তার ভেতরে বাইরে বড় বড় গাছ—আম, কাঁঠাল, জাম, নিম, বেল, অশথ ও বট—গোটা জায়গাটা ছায়া করে আছে। তাই মন্দিরটাও বেশ ঠাণ্ডা।

কুয়োর ধারে একটা ভাঙা টিনের সুটকেশ খুলে আধময়লা একটা চাদরের ওপর শাঁখা সিঁদুর ছোট ছোট টিন বাঁধান আয়না, কাঠের চিরুনী ইত্যাদি সাজিয়ে বসে থাকে একটা বছর সাতের মেয়ে—ওরই নাম মালি, যাকে নিয়ে গল্প,—কেউ ডাকে 'মাল্লি,' কেউ 'মালু।' ওর নাম বোধ হয় আসলে মালতি। মন্দিরে যারা প্রণাম করতে আসে—প্রায় সবাই আর কিছু না হোক দু পয়সার সিঁদুর কিনে চণ্ডীকে পরিয়ে যায়— চণ্ডীকে সিঁদুর পরিয়ে মানত করলে নাকি ফল পাওয়া যায়। তাই মালির ওই ভাঙা সুটকেশ দোকানের বিক্রি ভালই।

রাউতান মাসি আর পণ্ডাঠাকুর।

এই ভাঙা সুটকেশ ছাড়াও আর একটা দোকানের মত আছে এই চাতালে। ট্রেন বাসে যেমন নিত্য যাত্রী থাকে—এ পথেরও আছে—ডাকপিয়ন, ফরেস্ট গার্ড, চৌকিদার এরা তো আছেই—কিছু দোকান ব্যবসার লোকও রোজ যাতায়াতের পথে একবার অন্তত এখানে আসবে। কুয়ো থেকে জল তুলে হাত মুখ ধোবে—জল খাবে তারপর চাতালের ধারে রাউতান ডালি নিয়ে বসে পান সাজছে—তার কাছ থেকে শালপাতা মোড়া দুটো পান কি তিনটে বিড়ি নেবে নাট মন্দিরে বসে একটু গল্প গুজব করবে—তারপর সাইকেল বাজিয়ে চলে যাবে। রাউতান অবশ্য পান বিড়ি ছাড়াও তাল পাতার ছোট ছোট ঠোঙায় ভোগ দেবার নকুল বাতাসাও বিক্রি করে। মালি থাকে এই রাউতান মাসির কাছে।

চণ্ডী মন্দিরের চাতাল ঘিরে যে দেয়াল তাতে পিঠ দিয়ে রাউতানমাসির ছোট কুঁড়ে ছাড়াও আছে বড় বড় কয়েকটা মাটির খড়ের ঘর—এই মন্দিরের 'পণ্ডা' বা পুরুত ঠাকুর আর তার কজন আত্মীয়দের। মেলার সময় তিন চারদিন এখানে বিশাল ভিড়—তাঁবু খড়ের ছাউনি চটের ঢাকা দেওয়া ঘরে রাস্তার দু ধার, নদীর ওপরের বালি থেকে শাল জংগল পর্যন্ত ভরে যায়। তখন পণ্ডা ঠাকুরের এই সব আত্মীয়রা কেউ দোকান খুলে চণ্ডী মাহাত্ম্য কি রঙবেরঙের চুড়ি বিক্রি করে, কেউ মন্দিরে যাত্রীদের পুজো দেওয়ায়, কেউ বা দোকানীদের কাছ থেকে 'তোলা'—দেবীর ভোগের জন্য রোজকার চাঁদা—আদায়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। অন্য সময় তারা সবাই ঝাড় সুগুড়া রেল স্টেশানে না হয় বিড়ি কোম্পানী

গুলির গদিতে গদিতে পুজো করে বেড়ায়। সব সময়ের জন্য আছে মন্দিরের ভেতরে ওই জল তোলা পান বেচার রাউতান পণ্ডাঠাকুর আর ঠাকরাণ। আর আমাদের মালি বা 'মাল্লি'— যাই হোক।

মালি—কারো কেউ নয়।

মালি যদিও এই মন্দিরেই সব সময় সিঁদুর শাঁখা বিক্রি করে, রাউতান মাসির কাছে শুয়ে ঃ ক ও এখানে কারো কেউ নয়—এই ভাঙা সুটকেশ দোকানটাও পণ্ডাঠাকুরের। রাউতান মাসির বাড়ি যদিও কাছে,গাঁয়ে—মন্দিরের কাজ আর পান দোকান করে সে আর ঘরে ফিরে যায় না—ওই ছোট কুঁড়েটায় থেকে যায়। মালির সব বায়না সব আবদার এই রাউতান মাসির কাছে।

মালির ভয় ঐ পণ্ডাঠাকুরকে—যদিও উনিই ওর বা ওদের অর্থাৎ মালি, রাউতান এবং আরো দুটো প্রাণী—'কলা' (কালা) কুকুর এবং 'ধালি' (সাদা) বেড়াল এদের সকলেরই আশ্রয় দাতা। পণ্ডাঠাকুরের—মন্দিরের কিছু ধান জমি, ফল বাগান আর পুজোর প্রণামীতে ভাল ভাবেই চলে যায়—সেই সংগে এই কটা প্রাণীরও কোন মতে।

'কলা'র এলাকা নদীর এপার থেকে জংগলের মোড় পর্যন্ত। এমনিতে মন্দিরের বাইরের ফটকের সামনেই রাতদিন সামনের দু পায়ের ওপর মুখ নামিয়ে শুয়ে থাকে আর মালির খাওয়া হলে রাউতান মাসির কুঁড়ের সামনে এসে লেজ নাড়তে থাকে ওর ভাগের জন্য। কালে ভদ্রে জংগলের বা থানার জীপ এ পথে এলে 'কলা'র হাঁকে ডাকে সবাই অস্থির হয়ে যাবে। আসলে 'কলা' ভয় পেলেই ডাকে—আর প্যাণ্ট শার্ট পরা লোককে ওর ভয়। ধলি'র কথা আলাদা। নদীর ধার ঘেঁষে ধান খেত—যতদূর চোখ যায়—আর তাই ইঁদুরও খুব—তাদের বড়ো গুলো প্রায় 'ধলি'র মতই। তবে যতই হোক 'ধলি' হল বাঘের মাসি। প্রায়ই দুএকটাকে ধরে পেট ভরায়,না হলে মন্দিরের শিব ঠাকুরের বরাদ্দ দুধে ভাগ বসায়। ঠাণ্ডা পড়লে ধলি মালির বিছানার চটগুলোতে প্রায় সারাদিনই ঘুমোবে। সন্ধ্যা হলেই চোখের মণিগুলো গোল গোল হয়ে যাবে—সারা মন্দির, ঠাকরাণের পাকশাল এমন কি নদীর ধার, মাঠ সব চষে বেড়ায়—আর ভোর রাতে 'ম্‌ম্‌ম্‌' করতে করতে শীতে গুটিসুটি মালির পিঠের ওপর কি পেটের সংগে লেগে খড়খড় শব্দ তুলে একটা লোমের বল হয়ে শুয়ে পড়বে। মন্দিরের দেয়ালের ওপিঠে অবশ্য পণ্ডাঠাকুরের গোরু দুটোও আছে। তবে এ গল্পে তারা কেউ শিং লেজ নাড়ে নি।

আর মালি বা মাল্লি—খুব সক্কালে রাউতান মাসির সংগে মন্দির ঝাঁট দেবে—জল দিয়ে পুঁছবে—ঠাকরাণ আর রাউতান মাসির জন্য জংগল থেকে কাঠ কুটো শুকনো পাতা কুড়িয়ে আনবে—ছোট ঘড়া করে কুয়ো থেকে জল তুলবে। একটু বেলা হলে যখন মন্দির খুলবে—শাঁখা সিঁদুরের সুটকেশটা খুলে কুয়োর ধারে বসে যাবে। বিক্রির পয়সা সংগে সংগেই পণ্ডা ঠাকুরের হাতে দিয়ে আসবে। তবে একটু ফাঁক পেলেই মন্দিরের ফটকের পাশে গিয়ে দাঁড়িয়ে যাবে—রাস্তার দিকে তাকিয়ে—শহরের দিক থেকে আসা প্রতিটি লোককে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখবে—প্রত্যেকটি সাইকেল, গরুর গাড়ি - পায়ে হাঁটা লোককে। এজন্য প্রায়ই বকা খায়—কখন সখন চড় চাপড়ও। রাউতান মাসি শুধু বকেই, মার ধোর সে সব পণ্ডাঠাকুর আর ঠাকরাণ। ডাকের সংগে সংগে সাড়া না দিলে বিপদ। সব সময় কি মালি সব শুনতে পায় !

মালির বাপার গায়ে খুব জোর !

এই বনজারী বৃন্দামলের রাস্তা আরও অনেক ভেতরে চলে গেছে—নদী বন পাহাড় ডিঙিয়ে—গরুর গাড়িতে একদিন দুদিন লাগে এমন সব জায়গায়, জংগলের ভেতরে ছোট ছোট অসংখ্য

গ্রাম—কোথায় দশ পনেরো ঘর—কোথাও আরো বেশি। সেখানে কেউ ট্রেন দেখেনি—বিজলী বাতিও দেখেনি। সরকারি বা মহারাজার জীপ দেখলে লোক ভয়ে পালাত। সেখানে ছোট ছোট পাথ'র বালির নদী আর দু একটা বড়ো বড়ো বন্‌ধ্‌ বা দীঘি—মাঝে মাঝে খড় মাটির ঘর, 'ধানের খেত, হরি মেলা—গাছে ঘেরা মানুষের সহজ জীবন। গোরু মোষ চরিয়ে, সামান্য চাষ করে, নদী পুকুরের মাছ ধরে মোটামুটি চলে যেত। এ রকমই একটা গাঁয়ে ছিল মালিদের ঘর। দুটো মোষ আর একটা গোরুও—আর ছিল নদীর ধার ঘেঁষে জমি। তিন চারটে মাটি আর খড়ের ঘরের বাড়িতে কে কে বা কারা থাকত সে আর মালির মনে নেই। শুধু মনে পড়ে—মা, ভারি ভাল আর কি সুন্দর ; খুব ছোট একটা ভাই, কথা বলতে পারে না, শুয়ে শুয়ে আঙুল খায় আর আঁ আঁ করে—আর একটা বুড়ি একদম থুথুড়ি—সোজা হতে পারে না—সারাদিন মার সংগে ঝগড়া করে। আর 'বাপা' তার বাবা—সব থেকে ভাল, ভীষণ জোর গায়ে—খড় দিয়ে বাঁধা বড় বড় ধানের ডোল গুলো একাই দু হাতে পিঠে তুলে নিয়ে গরুর গাড়িতে তুলে দিত—সে রকম একটা ডোল নাড়তেই দু জন লোক লাগে। মোষের গাড়ি চড়ে ধানের ডোলের ওপর বসে বাবার সংগে মালি যেত অনেক দূরে দূরে কখনো কুচিন্তা, কখনো কোলে বিরার হাটে। সেই অন্ধকার থাকতে রওনা হত—বিশাল বিশাল দুটো মোষ গাড়ি নিয়ে হড়্‌হড়্‌ গড়্‌গড়্‌ করতে করতে ঢাল বেয়ে কখনো কঞ্চ কঞ্চ করতে নদীর বালি পেরিয়ে উঁচু খাড়াই বেয়ে। মালির,কখনো বাপার পিঠে কখনো কাঁধে, দু হাতের মুঠায় বাপার মাথার চুল ধরে গাড়ির তালে তালে দুলতে দুলতে , হাটে পৌঁছতে সূর্য কখনো মাথায় উঠে যেত। কুচিণ্ডার হাটের ধারে বিশাল দীঘি—ওপারে বাস রাস্তা—বামরা থেকে দেও গড় যেখানে মহারাজার গড় প্রাসাদ। ধান চাল বেচা টেচা হয়ে গেলে বাপা ওকে কোলে নিয়ে নেমে যেত দীঘির জলে—বাপার গলা ধরে স্নান করতো। তারপর বড় গামছা পেতে গাছ তলায় বসে শাল পাতার ঠোঙায় গরম ভুজিয়া—পকৌড়ি কি এক আধটা জিলিবি আর মুড়ি মজা করে খাওয়া। ওরই মধ্যে এক ফাঁকে বাপা কিনবে লালটিনের জন্য মাটি তেল, ডাল, আলু, লবণ। মা ওকে বলে দিত বাবাকে মনে করিয়ে দিতে কাঁচের চুড়ি আর সিঁদুরের কথা—এখন কত সিঁদুর মালির কাছে। বাবা পরপর দু হাট ভুলেই গেল সিঁদুর আনতে।

খরা ও একটা পুঁটলি

সেবার বৃষ্টি হল না সময় মত—যাও বা হল খুব সামান্য। ধানের চারা সব শুকিয়ে গেল—শুকিয়ে গেল নদীর জল—মাথায় বড় বড় হাণ্ডি বা হাঁড়ি নিয়ে মা যেত অন্য মেয়েদের সংগে বহুদূরে জল আনতে। বাপা একদিন মোষ দুটো নিয়ে কোথায় দিয়ে এল—মা সারাদিন কেবল কাঁদল। হঠাৎই সুরু হল—অসুখ, সেই বুড়িটা মরে গেল। একদিন ভোর বেলা মাও বিছানা ছেড়ে উঠতে পারল না। কে কোথায় চলে গেল—মালি বুঝতেও পারে না মনে করতে ও পারে না। শুধু মনে পড়ে একদিন ভোর রাতে বাপা একহাতে একটা পুঁটুলি নিয়ে মালির হাত ধরে হাঁটতে সুরু করে—সংগে আরও কারা ছিল—তারপর একদিন দুপুরে এই চণ্ডী মন্দির। এখানে তখন তাদের মত কত লোক আসছে—সবাই যাচ্ছে ঝাড়সুগুড়া—সেখান থেকে সম্বলপুর—কি রাউরকেল্লা না হয় ভিলাই কি ওদিকে কলকাতা—কোথাও না কোথাও নিশ্চয়ই কাজ পাওয়া যাবে।

এই মন্দিরে এসে বাপা পণ্ডাঠাকুরের পায়ের কাছে গড় হয়ে একটু প্রসাদ চাইতে—পণ্ডাঠাকুরের বোধহয় দয়া হয়ে থাকবে—এক বাটি জল ভাত দিয়ে ছিল তাদেরকে,—কতদিন পরে ভাত খাওয়া ! খেয়ে মালি আর নড়তে পারে

নি—পুঁটুলিটা মাথায় দিয়ে নাটমন্দিরেই ঘুমিয়ে পড়েছিলো। ঘুম থেকে উঠে আর বাপাকে দেখতে পায়নি—শুধু পুঁটুলিটাই ছিল মাথার নিচে। এই রাউতান মাসি তাকে কোলে করে খুব আদর করেছে—বলেছে তার বাপা শহরে গেছে কাজ খুঁজতে - কাজ পেলেই এসে মালিকে নিয়ে যাবে। ততদিন মালি মা চণ্ডীর পায়ের তলায় পণ্ডা-ঠাকুরের আশ্রয়ে থাকবে—খেলবে খাবে আর রাউতান মাসির কাছে ঘুমোবে—গল্প শুনবে।—সে আজ তিন বছর। তাই মাঝে মাঝেই মালি মন্দিরের ফটকে দাঁড়িয়ে দেখে—ঐ যে লোকটা আসছে - সে কি ওর বাপা? মাঝে মাঝে মনে হয় বাপা এলে বাপা যদি ওকে চিনতে না পারে—ও যদি বাপাকে চিনতে না পারে - বাপা যদি এই মন্দিরটা খুঁজে না পায়!......

এক অধ্যাপক পত্নীর বায়না

জয়দেব বাবু সম্বলপুরের ওদিকে কোন কলেজে অধ্যাপনা করে। ওরা নিঃসন্তান। ওর স্ত্রী রাধা একবার বায়না ধরে ঝাড়সুগুড়ার ওই চণ্ডীমন্দিরে যাবে সিঁদুর পরাতে। ওখানে থানা অফিসার ছিল হরিপ্রসাদ সাহু জয়দেব বাবুর সহপাঠী। ঠিক হল ঝাড়সুগুড়া থেকে হরিপ্রসাদই ওদেরকে নিয়ে যাবে ওই মন্দিরে ওর জীপে।

একদিন বিকেলে রাধা জয়দেব, হরিপ্রসাদের সংগে গিয়ে হাজির হল চণ্ডীমন্দিরে—সারা গায়ে মাথায় লালধুলো মাখা হয়ে মন্দিরের জামগাছটার সামনে এসে দাঁড়াতেই—'কালা' কুকুরটা মহা হৈ চৈ শুরু করে দেয়। ওর হৈ চৈ তে মালিকে প্রথমটা কারো চোখে পড়েনি। ওকে দেখতে পায় রাধা—একটা হাড় জিরে মেয়ে বড় বড় চোখ তুলে ওর দিকে হাঁ করে তাকিয়ে আছে—চোখে পলক পড়ছে না। পণ্ডাঠাকুর তাড়া দিলেও সে নড়ে না। রাধা হাত বাড়াতেই ও 'মা' 'মা' বলে ছুটে এসে ওকে আঁকড়ে ধরে দুহাতে আর কান্না। সবাই অবাক ওর কাণ্ড দেখে। রাউতান মাসি ওকে ছাড়াতে এলে সে আরও জোরে আঁকড়ে ধরে চেঁচাতে থাকে—'মোর মা,' 'মু ঘরকে যিমি,' 'মোতে ঘরকে নেই চল্।' মালির পরিচয় শুনে জয়দেব খানিকটা অনুমান করতে পারে ব্যাপারটা। রাধা ততক্ষণে ওকে কোলে নিয়ে বসে গেছে নাটমন্দিরে আর মালি বুকে মুখ গুঁজে সমানে কেঁদেই চলেছে। রাধা ওর মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে বলতে থাকে 'যি মি মা, চাল, যিমি ঘরকে। (যাব মা, চল যাব ঘরে)

পণ্ডাঠাকুর বলতে শুরু করে—মালি তার বড় আদরের—মেয়ের চাইতে বেশি। কত কষ্টে এই মা-বাপ হারা মেয়েকে তিনি মানুষ করছেন। তার স্ত্রী মালিকে ছেড়ে থাকতে পারবে না, ইত্যাদি। রাউতান মাসি ওদিকে হরিপ্রসাদকে বাইরে ডেকে নিয়ে ফুস ফুস করে সবই বলে দিয়েছে। তারপর শুরু হল মালিকে নিয়ে দর কষাকষি জয়দেববাবু আর হরিবাবু—অপরদিকে পণ্ডাঠাকুর আর তার এক নিষ্কর্মা ভাগ্নে। শেষ পর্যন্ত হরিবাবু কি সব আইন-টাইন বলাতে পণ্ডা ঠাকুর একটু নরম হল। রফা হল দেড়শ টাকায়। মালি একটা শত ছেঁড়া ছোট লাল শাড়ি পরে সেই পুঁটুলি আর 'ধলি'কে নিয়ে জীপে উঠতে যায়। তা ধলির জীপে চড়া পছন্দ হবে কেন? সে আঁচড়ে টাচড়ে পালিয়ে যায়। 'কলা' কিন্তু জীপের পিছু পিছু ডাকতে ডাকতে নদীর এপারে চলে এসেছিল। খুব কেঁদেছিল রাউতান মাসি। আর ঠাকরাণের নাকি খুব অসুখ। তিনি আর ঘর থেকে বেরোন নি।

মালি সেই থেকে' সম্বলপুরে। এখন বেশ লম্বা ছিপছিপে দেখতে হয়েছে—মুখটা অনেকটাই রাধার মতই - রঙটাও মনে হচ্ছে রাধার মতই হবে। কিন্তু জয়দেবকে 'বাপা' বলাতে ওকে অনেক বলে কয়ে রাজি করাতে হয়। কি করে হবে? জয়দেব তো আর দু হাতে ধানের ডোল তুলতে পারে না।

আমি একবার জীপ নিয়ে কুচিণ্ডা থেকে

বনের মধ্য দিয়ে ঝাড়সুগুড়া এসেছি। বনের মধ্যে এমনি অনেক ভাঙা ঘর, ফাঁকা গ্রামও দেখেছি। চণ্ডীমন্দিরেও গিয়েছি। 'কলা' কুকুর আমাকেও খুব বকাবকি করেছে। রাউতান মাসি মালির কথা বলে কেঁদেছে। তবে ধলিকে দেখতে পাইনি। মা চণ্ডীর ভাঁড়ার ঘরে এখন নাকি খুব ইঁদুরের উৎপাত—তাই সে বোধহয় ভাঁড়ারেই ছিল!

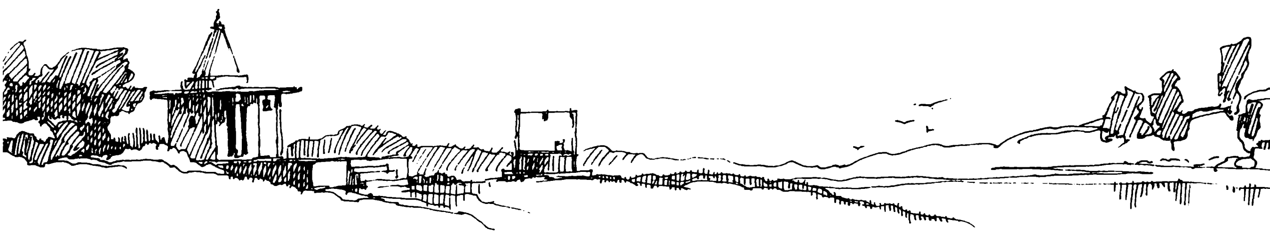

দুটো আমি

শুভশ্রী রায়

দুটো আমি আমার মধ্যে একত্রে বাস করে
একটা যখন বাইরে থাকে আরেকটা রয় ঘরে।
একটা আমি ভালবাসি পড়তে পড়ার বই
গল্পের বই অন্য আমির খুব পছন্দসই।
একটা আমি যখন তখন মাথা গরম করে
অন্য আমি চুপটি থাকি হাসিতে মুখ ভরে।
চুপ করে যাই একটা আমি লোক দেখলে পরে
কথা বলার ইচ্ছে খালি অন্য আমির করে।
একটা আমি ভূতকে ভরাই টিকটিকিকে ডরি
অন্য আমি অন্ধকারকে থোড়াই কেয়ার করি।
বর্ষা এলেই একটা আমি মেঘ দেখে হই খুশি
বৃষ্টি এলেই অন্য আমি আকাশটাকে দুষি।
একটা আমি মাঝে মাঝেই বলি কড়া কথা
অন্য আমি ব্যথা যে পাই কাউকে দিতে ব্যথা।
মোট কথা এই আছি ভালই দুই আমিতে ভাই
যখনই যাই যেখানেতে এক সঙ্গেই যাই।

পথ চলা

সুচিত চক্রবর্তী

হাঁটতে হাঁটতে খোকার যখন
পথ হারিয়ে যায়,
হালকা হাওয়া বইছে শুধু
নীল পাহাড়ের গায়।

পাহাড় থেকে ঝরণা ধারা
এলোমেলো বয়,
পাখ পাখালি খুশির খেলায়
তখন মেতে রয়।

কারা যেন পাহাড় বেয়ে
ছুটে ছুটে আসে,
পাহাড় বাসী তারাই হবে
থাকে গাঁয়ের পাশে।

কাটা-কুটি

তাপস রায়চৌধুরী

দুনিয়ার চারদিকে সবই দেখি কাটা
শীত কাটে রোদ্দুরে তাত্‌লেই গা'টা।
ছোট খোকা সারাদিন আঁক কাটে শ্লেটে,
আনাড়ির তবলার দেয় তাল কেটে।
গাঁট কাটে গাঁট-কাটা, সিঁদ কাটে চোরে,
সুতো কাটে চরকায়, রাত কাটে ভোরে।
পুলিসের লাঠি দেখে কেউ কেটে পড়ে,
শিল্পী পাথর কেটে মূর্তি'টা গড়ে।
কথা দিয়ে কথা কাটে, বিষ কাটে বিষে,
কেউ কি বলতে পারো—ভয় কাটে কিসে ?
দুধ যদি কেটে যায়, দেবে কে তা জুড়ে ?
বাদলের মেঘ কাটে আগমনী সুরে।
টিকিট কাটতে হবে বাসে উঠে আগে,
আলসেমো কাটে যদি, কাজে মন লাগে।
কাটে না সময়, তাই আমি কাটি ছড়া,
শুধু কাটা কাটি নিয়ে 'কাটা কুটি' গড়া ॥

আর ভয় পায়না

সুবীর গুপ্ত

ঘোষেদের ছোট ছেলে
নাম যার বঙ্কা
ছটফটে, ডানপিটে
যেন ধানী লঙ্কা।

দিন, রাত ছুটোছুটি
লাফালাফি করছে
ধর, ধর, ঐ বুঝি
আম গাছে চড়ছে।

চুপি চুপি মাঘ মাসে
শীত শীত দুপুরে
মার চোখে ধুলো দিয়ে
ঝাঁপ দেয় পুকুরে।

খালে, বিলে মাছ ধরে
ব্যাঙ ধরে নালাতে
ত্রাহি, ত্রাহি ডাক ছাড়ে
লোকে তার জ্বালাতে।

শুধু ভূতে ভয় পায়
ডাকা বুকো বঙ্কা
এই বুঝি ভূত আসে
মনে তার শঙ্কা।

রাত হ'লে মাকে ছাড়া
আর কিছু চায়না
মার কাছে শুলে পরে
আর ভয় পায়না।

টোটোর অ্যাডভেঞ্চার

টোটো গেল কোথায়?
এদিকে
ওঃ খুব জোর বেঁচে গেছি। ঐ কাঠের গজাল গুলোর ওপর পড়লে আর দেখতে হ'ত না!!
ওপরের মুখটাতে একটা পাথর গড়িয়ে বন্ধ হয়ে গেছে। কোন বেরোবার রাস্তা আছে কিনা দেখতে হবে
এদিকের সুড়ঙ্গটা দিয়ে যাই। ওঃ, মাথাটা কি ব্যথা করছে। কে জানে শিম্পুটা কি করছে
কি করি, রাত্রি হয়ে গেছে। চোখেও ভাল দেখছিনা!
ওঃ! কতক্ষন এই ভাবে হাঁটব। ওঃ আর পারছি না
ঐ দিকে একটু আলো দেখা যাচ্ছে। মনে হয় বেরোবার কোন রাস্তা আছে।
কিন্তু রাত্রিবেলা আলো দেখা যাচ্ছে কেন? এটা কি তবে ওরাঙ্গোর আস্তানা? সাবধানে এগোতে হবে। ওঃ মাথাটা .....
অন্যদিকে
বোরোগোকে খবর দিয়ে আজই রাতে আমি উরুঙ্গি ফিরে যাব

টোটো এখনও ফিরল না। আমার ব্যাপারটা একদম ভালো ঠেকছে না
মহারাজা, আমার মনে হয় টোটোকে খুঁজতে একটা সন্ধানী দল পাঠানো উচিত
নিশ্চয়; এক্ষুনি ব্যবস্থা করছি।
আরে ও রোঙ্গো মনে হচ্ছে!!
দাদা!
শোন! আমার বেশি সময় নেই। আগামী অমাবস্যায় উরকিঙ্গু বারুঙ্গা আক্রমন করবে। তুমি রাজপ্রাসাদ দখল করার জন্য লোকজন তৈরী রেখ!!
সে তুমি ভেবনা!
দাঁড়াও মজা দেখাচ্ছি।
আমি লোক ঠিক ক'রে রাখব!!
হাত তোলো!! কেউ নড়বেনা
ফের ঐ শয়তান টোটো!!
একটু নড়লেই মুণ্ডু উড়িয়ে দেব!!
তুই
যাবি!!
চোপ!
ওঃ আমার মাথা!!
টোটো অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেল
হাঃ হাঃ কোয়াম্বার অভিশাপে শয়তানটা এখন আমার হাতে!

চলবে

বনের খবর

প্রমদারঞ্জন রায়

একে তো বিশ্রী রাস্তা, দেওয়ালের মতন খাড়া পাহাড়, তাতে আবার বৃষ্টি হয়েছে—গোদের উপর যেন বিষ ফোঁড়া। আমি কাজে গিয়েছি, লোকজনদের বলে দিয়েছি একটা জায়গায় গিয়ে তাঁবু ফেলতে। ৩টার সময় কাজ শেষ করে ফিরতে আরম্ভ করেছি। বেজায় বন, মানুষের সমাগম নাই, খালি দলে দলে হাতী ফেরে। তাই একটু ছুটাছুটি করে পথ চলছি, পাছে রাত হয়ে যায়। লোকদের যেখানে যেতে বলে দিয়েছিলাম, তার ২/২৷৷ মাইল আগেই তাঁবু পেলাম। একটা হাতী পিছলে পড়ে গিয়ে চোট পেয়েছে, তাকে নিয়ে আর বেশী দূরে তারা যেতে পারে নি। কাজেই কি আর করা যায়? সন্ধ্যা হয়ে এসেছে, এখন ইচ্ছা না থাকলেও সেই খানেই থাকতে হবে। তাঁবুটি একটি ছোট্ট নদীর ধারে। রাস্তা থেকে ২০/২৫ হাত দূরে। নদীর উপর একটা বাঁশের পোল আছে।

খাওয়াদাওয়া করে সকলে শুয়েছি। এপ্রিল মাস, বেজায় গরম, তাই তাঁবুর দরজা বন্ধ করিনি! ডম্বর আর সোধন বলে দুজন খালাসী নদীর ধারে বালির উপর রান্না করে খেয়ে সেই খানেই শুয়ে আছে। তাদের ডাকা হল, কিছুতেই এল না।

প্রায় সকলেই ঘুমিয়ে পড়েছে, আমারও একটু একটু চোখ লেগেছে। এমন সময় শুনলাম, গঙ্গারাম দোভাষীকে বলছে, "দোভাষী ভাই, ওটা কি? ঐ দেখ পোলের উপর দিয়ে আসছে।" আমি কান খাড়া করে শুনতে লাগলাম—বাঁশের পোলটার উপর দিয়ে একটা বেশ বড় আর ভারী জানোয়ার আসছে; পোলটা তাতে ক্যাঁচম্যাচ করছে। পাশেই বন্দুক আর টোটা ছিল, হাতে নিয়ে চুপিচুপি তাঁবু থেকে বেরুলাম। পোলটার মাঝামাঝি এক জায়গায় গাছের ফাঁক দিয়ে একটু চাঁদের আলো পড়েছিল, সেইখানটায় জানোয়ারটা আসতেই দেখি, প্রকাণ্ড বাঘ! সেটা কিন্তু তখনি আবার অন্ধকারে ঢাকা পড়ে গেল। তারপর আমি বন্দুকে ছিটা ভরে গুড়ুম গুড়ুম দুটো আওয়াজ করতেই সে দুই লাফে জঙ্গলে গিয়ে ঢুকে পড়ল। গুলি মারতে আমার সাহস হয়নি। কেন না, অন্ধকারে এক গুলিতে সেটা না মারারই কথা। মিছামিছি তাকে চোট লাগিয়ে বিপদ ডেকে আনা কেন?

বন্দুকের আওয়াজে সকলের ঘুম ভেঙ্গে গিয়েছে। সোধন ত উঠেই এক দৌড়ে তাঁবুর মধ্যে! ডম্মর কিন্তু এল না। হাতীর মাহুত ডেকে বল্ল, 'ভাগ, ডমরা ভাগ। শের আয়া!' ডম্মরের তাতে ভ্রূক্ষেপও নাই। তখন দুতিনজন ছুটে গিয়ে তাকে ঠেলতে লাগল। সে জেগেই ছিল, ঠেলা খেয়ে চটে বল্ল, 'কেঁউ দিক করতা? শের আয়া তো ক্যা হুয়া? খায়গা তো হামকো যায়গা, তুমলোক কো ক্যা হৈ? হাম নহি যায়েগা!' সমস্ত রাত সে সেইখানেই কাটাল। পোলটা তার থেকে ১৫/১৬ হাত মাত্র দূরে ছিল!

লুশাই পাহাড়ে বাঘ মারার এক মজার ফন্দী দেখেছিলাম। বনের ভিতর বাঘ-ভালুক চলবার পথ আছে। সেই সব পথের কোন-কোনটা দিয়ে বাঘ বেশী যাওয়া আসা করে লুশাইরা আগে তার খোঁজ নেয়। তারপর সেই সব পথের ধারে ধারে যে যেখানে পাহাড়ের গা বড্ড ঢালু, সেখানে কোদাল দিয়ে খুঁড়ে আরো বেশী ঢালু আর গর্ত করে দেয়। তারপর লম্বা লম্বা বাঁশের খোঁটা পুঁতে পাহাড়ের গায় রাস্তার সমান উঁচু মস্ত মাচা বেঁধে, তাতে মাটি ফেলে, ঘাস লাগিয়ে ঠিক সমান জমির মত বেমালুম করে রাখে। মাচার তলায় থাকে ফাঁক, আর তার ঠিক নীচে, মাটিতে থাকে এই বড় বড় ভয়ংকর ধারাল সব 'বল্লম' পোঁতা। এসব জিনিসকে ডালপালা দিয়ে ঢেকে এমনি ঝোপের মতন করে দেওয়া হয় যে হঠাৎ দেখে বুঝবার যো নাই। আর, মাচার উপরে বেশ মোটাসোটা একটি কুকুর বা বা শুয়োরের বাচ্ছা এমনিভাবে বেঁধে রাখা হয় যে, মাচায় না উঠে তাকে পাবার যো নাই।

বাঘ মশাই দুলতে দুলতে পথ দিয়ে আসেন, আর দেখতে পান, ফলার তয়ের! বাস! অমনি

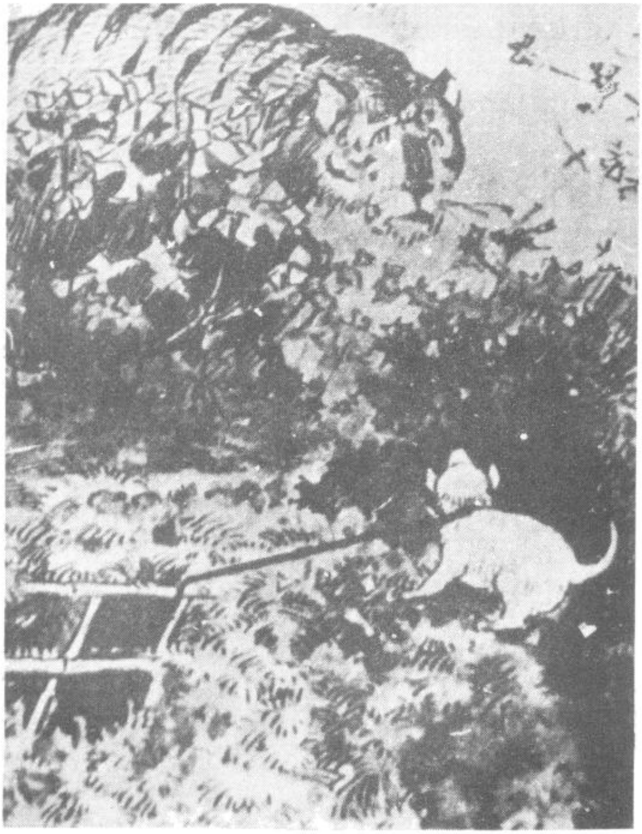

'হাল্লুম'! বলে দে লাফ, আর হুড়মুড়িয়ে মাচা শুদ্ধ পড় সেই বল্লমগুলোর উপরে! ফলার রইল মাথায় আর বল্লম ঢুকল পেটে, আর আকাশ ফাটল চ্যাঁচানির চোটে। তারপর ছটফটানি চলল, ততই আরো বল্লম গায় বিঁধতে লাগল। এমনি করে ঘণ্টা কয়েকের মধ্যেই সব শেষ।

বনের ভিতরে জরীপের কাজ করতে হলে, সামনে পিছনে দুজন লোকে নিশান ধরে, আর ঐ নিশান দেখে জরীপ দিয়ে মেপে যায়। অনেক সময়েই কিন্তু নিশানও দেখা যায় না। তখন একখানা ছোট্ট আয়না নিয়ে চমকাতে হয়, তার ঝিকিমিকি ৩/৪ জরীপ দূর থেকেও দেখতে পাওয়া যায়। আয়না চমকাবার সময় সামনের লোকটি সঙ্গে সঙ্গে চীৎকার করতে থাকে, তাতে ঠিক তার সোজাসুজি জরীপ দিয়ে মেপে যাবার সুবিধা হয়।

'ফুটকিয়া' নূতন লোক; সামনে থেকে চমক দিবার কাজটি তার হাতে। চমক দিয়েছে ঠিক, কিন্তু আওয়াজ আর দেয় না! ব্যাপার কি? সে পথে বাঘের ভয় আছে—লোকেরা আগেই আমাদের সাবধান করে দিয়েছিল। কাজেই আমার একটু সন্দেহ হল, আমি লম্বা লম্বা পা ফেলে আগে চললাম।

খানিক দূর গিয়েই দেখি কাদার উপরে ফুটকিয়ার পায়ের দাগ, আর তার পাশেই প্রকাণ্ড বাঘের পাঞ্জা! বাঘটা এইমাত্র গিয়েছে, তখনো চারদিকের জল গড়িয়ে এসে সেই দাগে জমছে। আমি খুব চীৎকার করে হাঁক দিলাম 'ফুটকিয়া!' হাত ২০/২২ সামনে ভাঙ্গা গলায় আওয়াজ হল, 'হুজুর!' তার সঙ্গে সঙ্গেই মনে হল যেন একটা কি জানোয়ার জঙ্গলে গা ঢাকা দিলে। দৌড়ে ফুটকিয়ার কাছে গেলাম। বেচারা রাস্তার মাঝখানে আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে, মুখে কথা নাই।

'কিরে। কি হয়েছে?' বল্লে, 'একটা কি আমার পিছু পিছু আসছিল।' 'কোথায় গেল?'

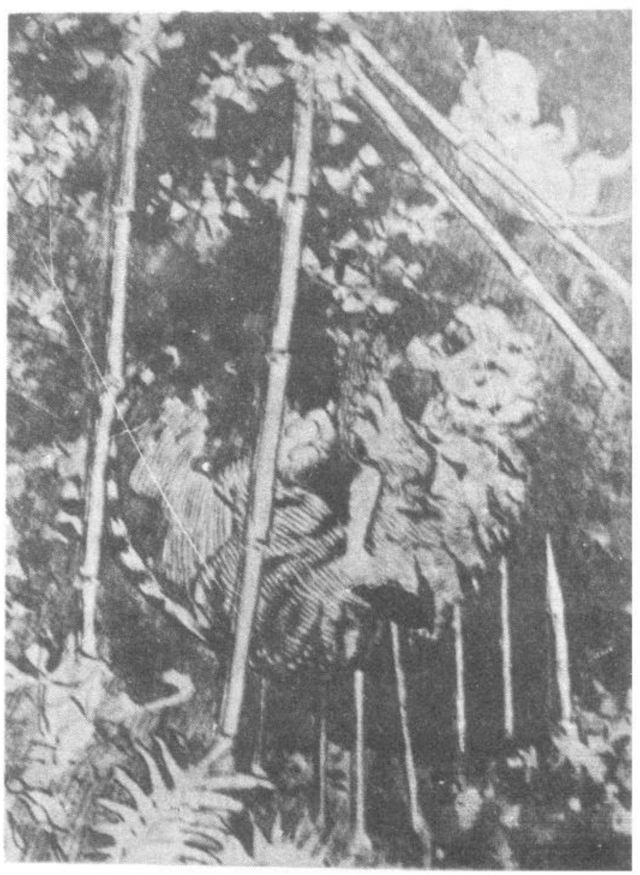

'এইখানেই ত ছিল, হুজুর ডাকলেন আর জঙ্গলে ঢুকে পড়ল।' যেখানটায় ছিল বলে দেখাল, সে জায়গাটা ফুটকিয়ার কাছ থেকে ৭/৮ হাত দূরে হবে।

'কেমন জানোয়ার ছিল রে?' 'তানি মটুকে তো থা।' বলে হাত দিয়ে মাটি থেকে ফুট দুই উঁচু দেখাল। 'লাল লাল ঔর কালা ভি থা। এৎনা বড়া উসকা শির থা, ঔর দুম হিলাতা থা!' 'আরে শের থারে?' 'নহি হুজুর। শের হোতা—তো হামকো খা ডালতা নেহি?' ভাল! যে প্রকাণ্ড পায়ের দাগ, আর মিনিট খানেক আমার দেরী হলেই 'খা ডালতা' কিনা বুঝতে পেত!! আসল কথা ফুটকিয়া আর কখনো বাঘ দেখে নাই।

॥ চার ॥

দুজন সার্ভেয়ার বনে কাজ করতে গিয়েছে। একই নালার ধারে ৩/৪ মাইল উপর নীচে তাদের ডেরা। ঘোর জঙ্গল, বুনো হাতীর রাস্তা ছাড়া আর পথ নাই, ১৪/১৫ মাইল দূরে থেকে চালডাল এনে খেতে হয়, সঙ্গে ১০/১১ জন করে কুলি মাত্র। কাজ-কর্ম শেষ হয়ে আসছে, ৪/৫ দিনের বেশী বাকি নাই; তারপর তারা আরেক জায়গায় যাবে।

দুজনেই রাজপুত। ১ নং সার্ভেয়ার কাজ শেষ করে, তাঁবুতে এসে হাতমুখ ধুয়ে খেতে বসেছে। তার চাকরটিও তার সামনেই বসে খাচ্ছে, মাঝখানে হাত দুতিন মাত্র জায়গা। বেচারা দুগ্রাস ভাতও মুখে দেয়নি, আর অমনি 'হাল্লুম'! বলে এই বড় বাঘ এসে একেবারে দুজনের মাঝেখানে লাফিয়ে পড়েছে! বাঘ দেখেত তারা দুজনে গুলির মত দুদিক গিয়ে ছিটকে পড়ল। তারপর বাপরে! খাওয়া দাওয়া সব কোথায় রইল—দে জিনিসপত্র নিয়ে পিট্টান!

হাতীর রাস্তা ধরে প্রাণপণে তারা ছুটতে লাগল। ২/৩ মাইল গিয়েই তারা দেখল যে ২ নং সার্ভেয়ার তার কাজ শেষ করে তাঁবুতে ফিরছে। সে তাদের দেখে ভাবল বুঝি তাদেরও কাজ শেষ হয়ে গেছে। তারপর যখন শুনল তারা বাঘের ভয়ে কাজ ফেলে পালাচ্ছে, তখন সে ১নং সার্ভেয়ারকে বুঝিয়ে বল্ল যে, 'দেখ, কাজ ফেলে পালিয়ে গেলে বড় বদনাম হবে। জঙ্গলের কাজ, জানোয়ার ত হামেশাই পাওয়া যায়। আমার কাজ শেষ হয়েছে। কাল থেকে চল দুজনায় মিলে তোমার কাজ শেষ করি। দুতিনদিনেই শেষ হয়ে যাবে, তখন সকলে এক সঙ্গে যাব। আমাদের দুজনের ডেরা এক জায়গায় থাকলে আমরা ২০/২২ জন লোক হব, তাহলে আর কোনো জানোয়ার আসবে না।'

একথায় ১নং সার্ভেয়ার রাজী হয়ে ২ নম্বরের সঙ্গে তার তাঁবুতে গেল। সেখানেও ভাত তয়ের। দুদলে মিলে তাই ভাগ করে খেতে বসেছে। একজন খালাসীর খাওয়া হয়ে গেছে, সে বেচারা ডেরার পাশেই একটা নালায় গিয়েছে তার থালাখানা ধুতে। অমনি বাঘ এসে লাফিয়ে পড়েছে তার ঘাড়ে! কারু মনে হয়নি যে সে বেটা এই ৩/৪ মাইল পথ হেঁটে তাদের পিছু পিছু আসবে। বাঘে ধরতেই ত লোকটি চেঁচিয়ে উঠেছে, আর তার সঙ্গে সঙ্গে আর সকলেও এমনি চীৎকার জুড়েছে যে কি বলব!

২ নং সার্ভেয়ারের টিণ্ডেল (সর্দার খালাসি) নান্দো বাহাদুর লোক। এর আগেও বর্মায় দু-একবার বাঘের সঙ্গে তার হাতাহাতি হয়েছে। সে তখনই ধুনী থেকে একটা জ্বলন্ত বাঁশ নিয়ে ছুটে গিয়ে ধাঁই করে বসিয়েছে একেবারে বাঘের মাথায় এক ঘা! বাঘও তাতে সেই লোকটাকে ছেড়ে নিয়ে নান্দোকে ধরে বসতে আর তিলমাত্র দেরী করে নি।

নান্দো কিন্তু ছাড়বার পাত্র নয়। তার বাঁ হাত রইল বাঘের মুখে, আর ডান হাতে সেই বাঁশ দিয়ে সে দিল বেটার নাকমুখে থেঁৎলো করে। বাঘ তখন বেগতিক বুঝে তাকে ছেড়ে নালার ওপারে যেতে পারলে বাঁচে। তা দেখে

নান্দোও সেই লোকটিকে তুলে উপরে নিয়ে এল।

বাঘ কিন্তু যায়নি, ওপারে বসে গড়্গড় করছে। সকলে গিয়ে ভয়ে তাঁবুর ভিতর ঢুকল, আর প্রাণপণে তাঁবুর দরজার ধুনীটি উস্কিয়ে দিতে লাগল। বাঘ কি তাতে মানে! তার মুখের গ্রাস কেড়ে নেওয়া হয়েছে, সে সহজে ছাড়বে কেন? নালা ডিঙ্গিয়ে এসে সে তাঁবুর চারধারে ঘুরতে লাগল। এক একবার বিষম রাগে তাঁবুতে থাবা মারে, আর তার গর্জ্জন কি ভীষণ!

এ দিকে তাঁবুর ভিতরে সবাই মিলে প্রাণপণে চেঁচাচ্ছে আর থালা ঘটি কেরাসিনের টিন, যা পাচ্ছে তাই নিয়ে খুব করে পিটছে। এমনি করে করে রাত ঢের হয়ে হয়ে গেল, বাঘটাও তখন একটু চুপ করল। ধুনীটাও ততক্ষণে একটু নিবু নিবু করতে লেগেছে। বাঘের সাড়া শব্দ নাই, হয় ত চলে গিয়ে থাকবে, এই ভেবে একজন সাহসে বুক বেঁধে সেই ধুনী উস্কিয়ে দিতে বাইরে এল। অমনি আর সে যাবে কোথায়? হতভাগা বাঘ ধুনীর পিছনেই বসেছিল, লাফিয়ে এসে তার ঘাড়ে পড়েছে!

এখন এ বেচারাকে কে ছাড়ায়? আর কে ছাড়াবে? নান্দোর হাত দিয়ে দরদর করে রক্ত পড়ছে, তাতে তার ভ্রূক্ষেপ নাই,—আবার ধুনী থেকে জ্বলন্ত কাঠ নিয়ে কসে বাঘের মাথায় এক ঘা বসিয়ে দিল। বাঘ নান্দোকে বেশ চিনে নিয়েছে,—তাই এক ঘা খেয়ে আর সে দু ঘার জন্য দাঁড়াল না, তার মনে হল যে যে এবার লেজ গুটিয়ে সরে পড়াই ভাল।

তখন সেই লোকটিকে তাড়াতাড়ি তাঁবুর ভিতরে এনে সকলে মিলে চেঁচিয়ে আর থালা ঘটি বাজিয়ে রাত কাটাল। সকালে উঠেই জিনিসপত্র সব ফেলে শুধু নক্সাগুলো নিয়ে দে চম্পট। দুদিন পরে সেখানে গিয়ে দেখা গেল যে, বাঘটা রাগে তাঁবুটিকে কামড়িয়ে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ছে। এক বস্তা চাল আর একটা তেপাই ছিল, তাকে চিবিয়ে আর কিছু রাখেনি। প্রথমে যে লোকটিকে বাঘে ধরে ছিল, সে তিন দিন পরে মরে গেল। নান্দো আর অন্য লোকটি তিন মাস ভুগে ভাল হল।

কথাবার্ত্তা

ফুটবল্ খেলা দেখিতে চাও ত চীনদেশে যাও। হঠাৎ সে খেলা দেখিলে হয় তো তুমি ছুটিয়াই পলাইবে, ভাবিবে বুঝি ভারী একটা যুদ্ধ চলিয়াছে। এক এক দলে পঞ্চাশ জন করিয়া লোক থাকে, আর খেলার সময় তাহারা প্রাণ ভরিয়া চ্যাঁচায়। খেলার নিয়ম টিয়ম তাহাদের কিছুই নাই; যেন তেন প্রকারেণ একটা ছোট্ট ঝুড়ি নিয়া বিপক্ষের এলাকায় ফেলিতে পারিলেই হইল। খেলিবার জন্য মাঠে যাইতে হয় না, রাজপথেই সুন্দর কাজ চলিয়া যায়। আর তাহাতে এই একটা ভারি সুবিধা হয় যে, আর কোন রকমে না পারিলে, বলটিকে শুদ্ধ চুপ চাপ পাশের কোন একটা বাড়ীর চালে উঠিয়া অলক্ষিতে গিয়া শত্রুর শিবিরে উপস্থিত হওয়া চলে; তাহাতে কেহ কোন আপত্তি করে না, 'রেফারী'ও নাই, যে কিছু বলিবে। বল লইয়া কেহ পলাইবার সময় তাহাকে তিন চারি জনে খুব করিয়া চাপিয়া ধরিলে সেটা বেদস্তুর হয় না। সে বেচারা চাপনে পড়িয়া প্রাণপণে বাঁশী বাজাইয়া তাহার দলের লোককে ডাকিয়া আনে। বাঁশী সকলেরই এক একটা থাকা চাই; সেটি না হইলে চলে না। ফুটবল খেলাটা আমার বেশ লাগে, কিন্তু এ বয়সে আর তাহা শিখিবার ভরসা নাই। তবে, যদি চীনদেশী খেলার চল এখন কোন দিন হয় তবে একবার চেষ্টা করিয়া দেখিতে পারি।

আশ্বিন ১৩২০

শীত এলে

সুখেন্দু মজুমদার

ময়দানে যেই শীত নামলো পড়ল ঘাসে শিশির,
শহর জুড়ে বাসে ট্রামে চলছে ফিসির ফিসির।
সার্কাসটা বসছে কোথায়, কোথায় ক্রিকেট খেলা,
লোক গমগম দিনে রাতে চলছে নানান মেলা।
রঙ বেরঙে সাজলো মেলা সাজিয়ে নিয়ে পসরা,
অন্যদিকে চলছে তখন আরেক মেলার খসড়া।
দেখতে দেখতে যায় পালিয়ে মিষ্টি রোদের বেলা,
খবর এলো চলছে তখন ময়দানে বই মেলা।
পাপান সোনার দিন কাটে না ঘুম চোখে তার কই
ভাবছে শুধু কিনবে কবে মেলায় নতুন বই!

বই মেলা

আশিস কুমার মুখোপাধ্যায়

রূপকথার সেই রাজ্যে যাবে? রাক্ষসদের দেশও?
ভূতের সঙ্গে ভাব জমাবে? বইমেলাতে এসো॥

গোয়েন্দাদের সঙ্গে মিশে, রহস্যের-ই জট
খুলতে কী চাও? তবেই এসো বইমেলা চটপট॥

বিজ্ঞানেরও নানান মজা, অঙ্ক, ধাঁধাঁর খেলা
হরেক মজা সাজিয়ে দেখ ঐ ডাকে বইমেলা॥

৯৪৮-পৃষ্ঠার উত্তর—

কালাচাঁদ বলেছিল—'বেজায় শীত পড়েছে।'

প্রোফেসর বললেন—'বাবার জামা-জুতো নাকি?'

ডাইনে পাগলা দাশুর ছবিতে

(১) ছবির বাম দিকে খোকনের পাঞ্জাবীর হাতাটা একটু অন্যরকম,

(২) খোকনের মাথায় চুল নেই,

(৩) মাথাটাও যেন কেমন একপাশে টোল খেয়ে গিয়েছে,

(৪) পাঞ্জাবীর বোতাম নেই,

(৫) জুতোজোড়ার ওপরের বাহার অন্য-রকম,

(৬) খোকনের দিদির কানে দুল নেই,

(৭) হাতে চুড়ি কম,

(৮) এমনকি মাথার স্পষ্ট গাঢ়রঙের ফুলখানাও গায়েব!

(৯) দিদির হাতের আর পায়ের আঙুল ওস্তাদি ক'রে ভাগাভাগি করা।

৩৫৪ আপ প্যাসেঞ্জার

পরেশ দত্ত

রাত দুটোয় কুমড়োডাঙ্গা স্টেশন মাস্টারের ঘরে টেলিফোনের বেল বেজে উঠতে ঝট করে ঘুম ভেঙ্গে গেল এ. এস. এম. গড়াই বাবুর, ঘরে টিম টিম করছে কালিঝুল পড়া হ্যারিকেনের আলো।

'হ্যালো'—টেলিফোনের রিসিভার তুলে সাড়া দিলেন গড়াইবাবু।

ফোনের ওদিক থেকে সাড়া ভেসে এলো—'৩৫৪ আপ প্যাসেঞ্জার ছেড়ে দিয়েছি।'

৩৫৪ আপ! রিভিসার রেখে দিয়ে চমকে উঠলেন গড়াইবাবু। ৩৫৪ আপ তো সেই শেষ রাতে অ্যাক্সিডেন্ট করেছে মাইল দশেক পেছনের কদমপুরা স্টেশনের কাছে। স্টেশনের ডিসটাণ্ট সিগন্যালের কাছে দাঁড়িয়ে থাকার সময় পেছন থেকে একটা এক্সপ্রেস ট্রেন ঘন কুয়াশার মধ্যে দেখতে না পেয়ে ধাক্কা মেরেছে। খবর এসেছে ৩৫৪ আপের পেছনের তিন চারটে বোগি দেশলাইয়ের বাক্সের মতো একটার পেছনে আর একটা বেমালুম সেঁধিয়ে গেছে। কতজন যে ঘায়েল হয়েছে এখনও সঠিক জানা যায়নি। আপ ডাউন দুটো লাইনই ব্লক হয়ে থাকার জন্যে সারাদিন কোনো ট্রেন আর পাস করাতে হয়নি।

যাক এতক্ষণে তা হলে লাইন ক্লিয়ার হয়ে গেছে। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন গড়াইবাবু। পৌষের মাঝের রাত। বাইরে হাড়কাঁপানো শীতের বাতাস বইছে। কুয়াশায় ভালো করে নজর চলে না। স্টেশনের আলোগুলোও টিম টিম করছে। গায়ে ওভার কোট মাথায় টুপি চড়িয়ে দরজা খুলে সবুজ ফ্ল্যাগ হাতে নিয়ে বাইরে বেরিয়ে এলেন গড়াইবাবু।—'এই রামদীন?' পয়েন্টসম্যানকে হাঁক দিয়ে ডাকলেন গড়াইবাবু।

'হুঁজৌর।' মাথায় পাগড়ি ঠিক করতে করতে বুকিং অফিসের পাশের গুদাম ঘর থেকে বেরিয়ে এসে সেলাম ঠুকলো রামদীন।

'আপ গাড়ি আসছে।' জানালেন গড়াইবাবু।

'লাইন কিলিয়ার হয়ে গেছে হুজৌর?'

'হ্যাঁ পয়েন্ট ঠিক করে রাখ, গাড়ি পাশ করাতে হবে।'

কিছুক্ষণের মধ্যে কুয়াশার আড়ালে অনেক

দূরে ঘন ঘন হুইসিলের শব্দ পাওয়া গেল। অন্ধকার মাঠ থেকে গাড়ির গম্‌গম্‌ ঝম্‌ঝম্‌ শব্দ কাছে এগিয়ে এলো। গড়াইবাবু লক্ষ্য করলেন ট্রেনের হেডলাইট নেই। গড়াইবাবু ভাবলেন অ্যাক্সিডেন্টে গাড়ির অনেক কিছুই বিকল হয়ে গেছে।

দেখতে দেখতে গাড়ি প্ল্যাটফরমের ভেতর চলে এলো। ট্রেনের কোনো কামরাতেই আলো নেই। খুব ঢিমেতালে প্ল্যাটফরমে এসে দাঁড়াল ট্রেন। গড়াইবাবু টর্চ মেরে দেখলেন প্রচণ্ড শীতের রাতে গাড়ির সব কামরাতেই দরজা জানলা বন্ধ। ভেতরে কতজন যাত্রী আছে বাইরে থেকে বোঝা গেল না। থ্যাঁৎলানো কামরাগুলো পেছনের স্টেশনে কেটে রাখা হয়েছে।

ঝট্‌ করে একটা কামরার দরজা খোলার শব্দ পেলেন গড়াইবাবু। সুটকেস হাতে খোঁড়াতে খোঁড়াতে নেমে এলেন এক বয়স্ক ভদ্রলোক। পরনে ধুতির ওপর কালো ওভারকোট, পায়ে মোজা, মাথায় কমফরটার জড়ানো। —'এটা কী কুমড়োডাঙ্গা স্টেশন।'

'হ্যাঁ, কোথায় যাবেন আপনি?' জিজ্ঞেস করলেন গড়াইবাবু।

'পলাশডাঙ্গা গাঁয়ে।'

'এখান থেকে তিন ক্রোশ। রাতে কোনো গাড়ি পাবেন না।'

'আপনার স্টেশনে ওয়েটিং রুম আছে?' জিজ্ঞেস করলেন ভদ্রলোক।

'ক্ষেপেছেন', হো হো করে হেসে উঠলেন গড়াইবাবু, 'এই ছোট স্টেশনে ওয়েটিং রুম খুঁজছেন? ওসব বালাই এখানে নেই।' সবুজ ফ্ল্যাগ নাড়িয়ে গাড়ি ছাড়ার সিগন্যাল দিলেন গড়াইবাবু।

হুইসিল মেরে ট্রেন ছেড়ে দিল।

গড়াইবাবুর পিছু পিছু সুটকেশ হাতে ভদ্রলোক স্টেশন মাস্টারের ঘরে ঢুকলেন।

'এই রাত বিরেতে অজানা জায়গায় কোথায় যাব বলুন?'

'তা আমি কি জানি?'

'আজকের রাতটার মতো আপনার ঘরে যদি একটু থাকার ব্যবস্থা করে দেন।'

'ওই বেঞ্চিটাতে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়তে পারেন,' বলে দরজার দিকে পা বাড়ালেন গড়াইবাবু।

'ও দাদা—ও ভাই'—ব্যস্ত হয়ে উঠে দাঁড়ালেন ভদ্রলোক।

'এই অন্ধকার স্টেশনে একা থাকব কী করে দাদা। হার্টফেল করে মরে যাব মশাই।'

'আপনার হার্ট থাকলে অনেক আগেই ফেল করতেন।' চেয়ারে ফের ধপাস করে বসে পড়লেন গড়াইবাবু,'যত্তো সব। অন্ধকার ট্রেনে আসতে পারলেন আর অন্ধকারে থাকতে পারবেন না। কিসের ভয়? ভূতের?'

'ভূতকে কে না ভয় করে বলুন।'

'না মশাই ভূতের চাইতে আমি মানুষকে বেশি ভয় করি। বিশেষ করে স্টেশন মাস্টারকে; যে কোনো সময় চাকরি খেয়ে দিতে পারে।'

'প্লীজ আর কিছুক্ষণ থেকে যান দাদা।' কাঁদো কাঁদো মুখে হাত জোড় করলেন ভদ্রলোক।

'ভালো ফ্যাসাদে ফেললেন মশাই।' সামনের টেবিলে পা তুলে দিয়ে গড়াই মশাই বললেন, 'ভাবলুম ট্রেনটা পাশ করিয়ে দিয়ে কোয়ার্টারে গিয়ে লেপ মুড়ি দিয়ে টেনে ঘুম মারব। তা আর হলো না, যত্তো সব।'

'ভেরি সরি দাদা।'

'মশায়ের নাম'—টেবিলে পা নাচাতে নাচাতে জিজ্ঞেস করলেন গড়াই মশাই।

'মদনমোহন দস্তিদার।'

'দুনিয়ার সকলের সঙ্গে দোস্তি করে বেড়ান বুঝি।'

'তা বলতে পারেন। ওটাই আমার পেশা। মশায়ের নাম।'

'শ্যামাচরণ গড়াই।'

'তা ভালো, দিন রাত শ্যামা মায়ের চরণে গড়াগড়ি দেন।'

'মেলা ফ্যাচ ফ্যাচ করবেন না।' চোখ বুজিয়ে জিগ্যেস করলেন গড়াই মশাই, 'মশায়ের কী করা হয়?'

'জীবন বীমার এজেন্সী।'

'দালালী!' গড়াই মশাই অবাক হয়ে জিগ্যেস করলেন, 'তা এই অজ পাড়াগাঁয়ে কে আপনার কাছে জীবন বীমা করবে?'

'একজন পয়সাওলা জোতদারের খবর পেয়েছি,' জানালেন দস্তিদার বাবু, 'আপনারও জীবন বীমা করে দিতে পারি।'

'হুঁ, জীবনেরই ঠিক নেই—তার আবার বীমা!' দাঁত খিঁচিয়ে গড়াই বাবু বললেন, 'মরণ বীমা করতে পারেন।'

'মরণ বীমা?'

'হ্যাঁ মশাই—যাতে আর কোনো দিন জন্মাতে না হয়—'

জানলার একটা পাল্লা খুলে গড়াইবাবু বাইরে কী দেখার চেষ্টা করলেন। তারপর দস্তিদার বাবুর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'অ্যাক্সিডেন্টের সময় গাড়ির কোন দিকে ছিলেন – সামনে না পেছনে?'

'পেছনের দিকে।'

'পেছনের দিকে!' আঁতকে উঠলেন গড়াই বাবু। 'বলেন কী মশাই।'

'আমাদের ট্রেনের পেছনে এক্সপ্রেস ট্রেনটা ঝড়ের মতো ছুটে আসছে শুনে গাড়ি থেকে মাটিতে লাফিয়ে পড়েছিলুম। পা-টা মচকে গেল।'

'তাই বুঝি খুঁড়িয়ে হাঁটছেন।'

'বুঝতে পারছিনা হাড় টাড় ভাঙ্গলো কি না। ডাক্তারকে দেখাতে হবে।'

'কাউকেই দেখাতে হবে না। সকালের আলো ফুটলেই সব সেরে যাবে।'

'বলছেন গড়াই মশাই?'

'গড়াই মশাই কখনো বাজে কথা বলে না।'

রাত শেষ হয়ে আসছে পুব আকাশে ভোরের আলোর আভাস দেখা দিয়েছে।

'শীতে একেবারে কালিয়ে যাচ্ছি,' গড়াইবাবুর দিকেই হাত বাড়ালেন দস্তিদার বাবু, 'একটা বিড়ি খাওয়াতে পারেন?'

'না মশাই, ওসব পাট অনেককাল আগে চুকিয়ে দিয়েছি।'

'আমিও অনেক চেষ্টা করেছি, পারিনি।' বললেন দস্তিদার বাবু।

'এবার পারবেন।'

'ফের চেষ্টা করব।'

'চেষ্টা করতে হবে না—এমনিতেই হয়ে যাবে।'

দস্তিদার বাবু হাই তুলে জিজ্ঞেস করলেন, 'বিড়ি সিগারেট কতদিন আগে ছেড়েছেন?'

'তা বছর দশেক হবে'—সিলিংএর দিকে চেয়ে হাই তুলে তুড়ি মেরে বললেন, গড়াই মশাই, 'সে আর শুনে কী হবে। শীতের শেষ রাতে রামদীনের সঙ্গে কোয়ার্টার থেকে স্টেশন আসবার সময় লাইন পার হতে গিয়ে'—গড়াই মশাইয়ের কথা শেষ হবার আগেই প্ল্যাটফরমে কার যেন ভারী জুতোর শব্দ পাওয়া গেল। শব্দটা স্টেশন মাস্টারের ঘরের দিকেই এগিয়ে আসছে।

'এই রে স্টেশন মাস্টার আসছে', চেয়ার ছেড়ে তিড়িং করে লাফিয়ে উঠলেন গড়াই মশাই। 'পালান মশাই পালান।'

'পালাব?' দস্তিদার বাবু দাঁড়িয়ে উঠে ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'পালাব কেন?'

জানলার দিকে পা বাড়িয়ে গড়াই বাবু বললেন, 'ডিউটির সময় আপনার সঙ্গে আড্ডা মারছি দেখলে আমার চাকরি চলে যাবে।' বলেই এক লাফে জানলার পুব দিকে গরাদের ওদিকে গিয়ে দাঁড়ালেন। হাতছানি দিয়ে দস্তিদার বাবুকে ফিসফিস করে ধমকালেন, 'আঃ দেরী করছেন কেন মশাই—স্টেশন মাস্টার এসে পড়লেন বলে।'

'দরজা দিয়ে স্টেশন মাস্টার আসছে। জানলার গরাদের ভেতর দিয়ে কী করে যাব।'

'ধুত্তেরি মশাই।' দাঁত খিঁচোলেন গড়াই মশাই। 'সে তো আপনার অক্কা পাবার আগে। এখন আপনি বেমালুম হাওয়া হয়ে গেছেন। চেষ্টা করুন, খুব পারবেন।'

দস্তিদার মশাই লাফ দিয়ে দিব্বি জানলার গরাদের ওদিকে গিয়ে দাঁড়ালেন।

গড়াই মশাই খপ করে দস্তিদার বাবুর একটা হাত ধরে ধান ক্ষেতের দিকে দৌড় দিলেন। পেছনে পয়েন্টসম্যান রামদীন!

স্টেশন মাস্টার ঘরে ঢুকে কদমপুরায় ফোন করে জানলেন লাইন তখনও ক্লিয়ার হয়নি। রিলিফ ট্রেন এসে গেছে। তবে লাইন ক্লিয়ার হতে এখনও এক বেলা লাগবে।

সে এসেছে

কালিদাস ভট্টাচার্য

ঘুমটা ভাঙতে শুনি
ডাকে যত পাখি,
আমার ওঠার আগে
সে কি এল নাকি ?
সে আসার আগে রোজ
তাড়াতাড়ি উঠে
বাগানেতে গিয়ে দেখি
ফুল আছে ফুটে।
আমাকে জড়িয়ে ধরে
মিষ্টি বাতাস
দিয়ে যায় এই মনে
খুশি এক রাশ।
প্রতিদিন সে তো আসে
সাথে নিয়ে আলো,
ভয়েতে পালিয়ে যায়
আঁধারের কালো।
মুখে তার লেগে থাকে
মায়াময় হাসি
আমি তাকে মনে প্রাণে
খুব ভালবাসি।
তাড়াতাড়ি উঠে তাই
দেখি খুলে দোর
সত্যিই সে এসেছে
নাম তার ভোর॥

হিজিবিজবিজ

কি রে ন্যাড়া, মাথায় রুমাল বেঁধে অমন কাঠ হ'য়ে ব'সে আছিস কেন ?
আহ্, চ্যাঁচামেচি করিসনি; মাথায় বিশেষ তেল মেখেছি
কি হ'বে তাতে ?
চুল গজাবে।- বড়দা বলেছে
কখন রে ?
একঘন্টা পরে এলেই চুল দেখতে পাবি
এক ঘন্টা পরে
আয়না নিয়ে আমি তৈরী, এবার রুমালের গেরোটা খোল
খুলতেই
-হুর্‌রে !!! ঐ দেখ্ একখানা ঘন-কালো চুল .... আহা ! ....
সন্দেহ হচ্ছে
এ কি রে ন্যাড়া
দাঁড়া দাঁড়া ! - দেখেছিস পুঁচু, নতুন চুলটা হাওয়ায় দুলছে ...
এই ন্যাড়া, চুলটা তো উড়ে যাচ্ছে রে
ও ন্যাড়া, এযে তোর কালো বিল্লীর ন্যাজের লোম মনে হচ্ছে ! রুমালটাতেই আগে আটকেছিল বোধহয়
হায় হায় !!
ক

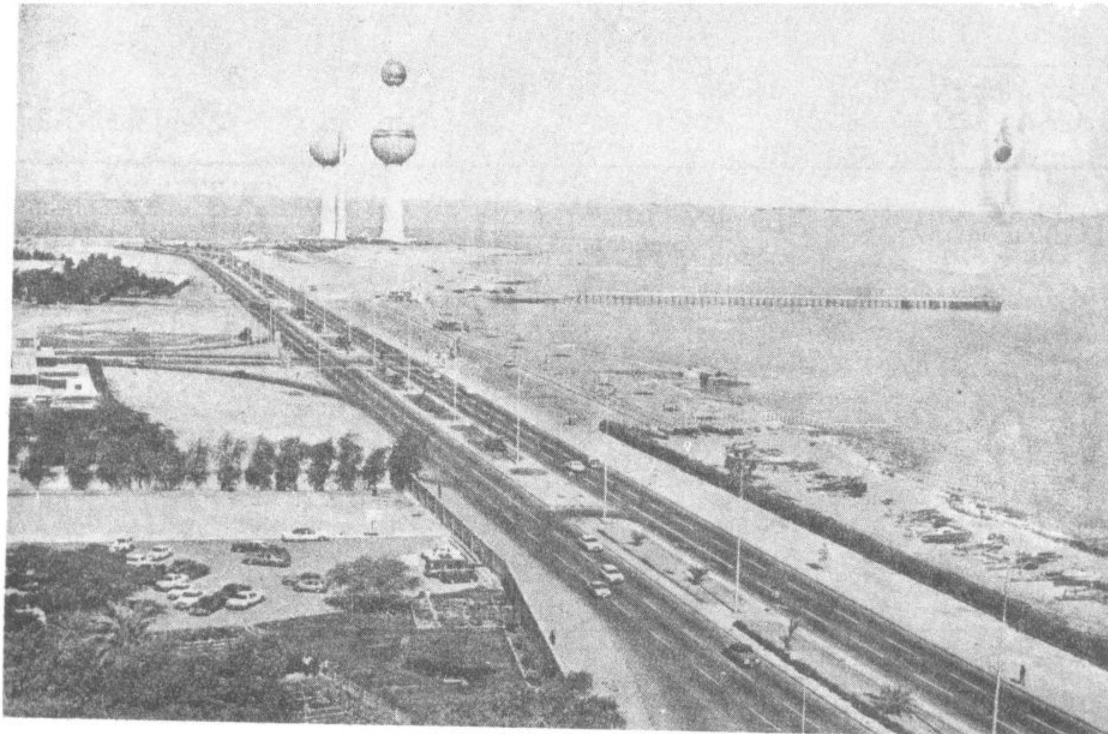

মরুসুন্দরী কুয়েত

মীরা দে

অসীম নীল আকাশের গায়ে প্রকাণ্ড উড়োপাখিটার পেটের ভিতর বসে অদেখাকে দেখবার আনন্দে প্রাণটা মশগুল হয়ে আছে। যাচ্ছি একটা নতুন দেশে বেড়াতে। ঘণ্টা তিনেক কোথা দিয়ে কেটে গেল। আরব সাগরটা দেখতে পেলাম না মেঘের সাগর ভেদ করে। হঠাৎ দেখি হু—স করে দম ছাড়তে ছাড়তে উড়োপাখিটা মাটি ছুঁলো—ঠিক মাটি নয়, বালি। চারিদিকে ধু ধু বালি।

মরুর দেশের এক রাজকন্যা আমায় স্বাগত জানাল—নামটি তার 'কুয়েত'। আরব দেশের উত্তর পুব কোণে এর অবস্থান। এর গা ঘেঁষে দুই প্রতিবেশী রাজ্য ইরাক ও ইরাণ, যেখানে সাত বচ্ছর ধরে যুদ্ধের অশান্তি চলেছিল। আরবের উপকূল ছুঁয়ে ছুঁয়ে বয়েচলেছে পারস্যোপ-সাগরের নীল জলধারা।

প্লেনের গায়ে লাগানো চোঙার মত টানেলের মধ্যে দিয়ে পৌঁছন গেল বিরাট ঘরে দিশি বিদেশী লোকের ভীড়ে। মাথায় কালো বিড়ে (গোটরা) আটকানো এক টুকরো তেকোনা কাপড় গায়ে, কালো জোব্বা ঢাকা, টকটকে ফর্সা বিশাল চেহারায় আরবীরা ঘুরে বেড়াচ্ছে আর হুমহাম শব্দে কথা বলছে। গাড়ী করে দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে বাড়ি যেতে হবে। আমার ছোট্ট দুই নাতনি তাদের মা বাবার সঙ্গে আমায় নিতে এসেছে। চলতি গাড়ির পিছনের কাচ দিয়ে এয়ারপোর্টটার দিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে গেলাম। একটা প্রকাণ্ড কংক্রীটের এরোপ্লেন যেন উড়বার অপেক্ষায়।

দেশটা যদিও রুক্ষ বালির, তবু পুরনো শহরকে ভেঙ্গেচুরে একেবারে ঝকঝকে চেহারার ঝলমলে পোষাকপরা এক আধুনিকা সুন্দরী বানিয়ে ফেলেছে ওরা। ওপর নিচ দুই থাকে তৈরি মসৃণ চওড়া রাস্তা, দুধারে সবুজ পান্না রঙের গাছের সারি, বাগান আর মাঝে মাঝে বালু প্রান্তরে ফুটে আছে বালুর দেশের নিজস্ব ফুল, রক্তকরবী, নয়নতারা আর বুগনভিলিয়া।

একদিন গেলাম বিখ্যাত আহমদী গার্ডেনে।

এটি শহরের বাইরে, আশেপাশে শুরু হয়েছে আসল মরুভূমি। কিন্তু উটের দেখা কোথাও পেলামনা। আহমদী গার্ডেনের সীমা খোঁজা ভার। পায়ের নিচে সবুজ মখমলের ঘাস, তার উপর নানা বুটিকাটা বিশাল গালিচা কে যেন পেতে রেখেছে। কেয়ারী করা কত মরসুমী ফুল, তাদের মাঝে সোনারঙা গাঁদাফুল দেখে প্রাণটা নেচে উঠল। আর জ্যান্ত

পেট্রল আবিষ্কারের পর থেকে, বিশেষ করে ১৯৪৬ এর পর পুরো দেশটা বিদেশী মুদ্রায় ফুলে ফেঁপে উঠেছে। পৃথিবীর সব দেশ তাকিয়ে আছে এদের দিকে তেলের জন্য। জাতটা বেশ আয়েসী। দিনার ও ফিল্‌সের (এদের মুদ্রার নাম) প্রাচুর্যই বোধহয় এর প্রধান কারণ। শিক্ষাক্ষেত্রেও এরা মাত্র কয়েক বছর হল সচেতন হয়েছে। বাড়ির সামনে পাকা গোল ঘরে গোল

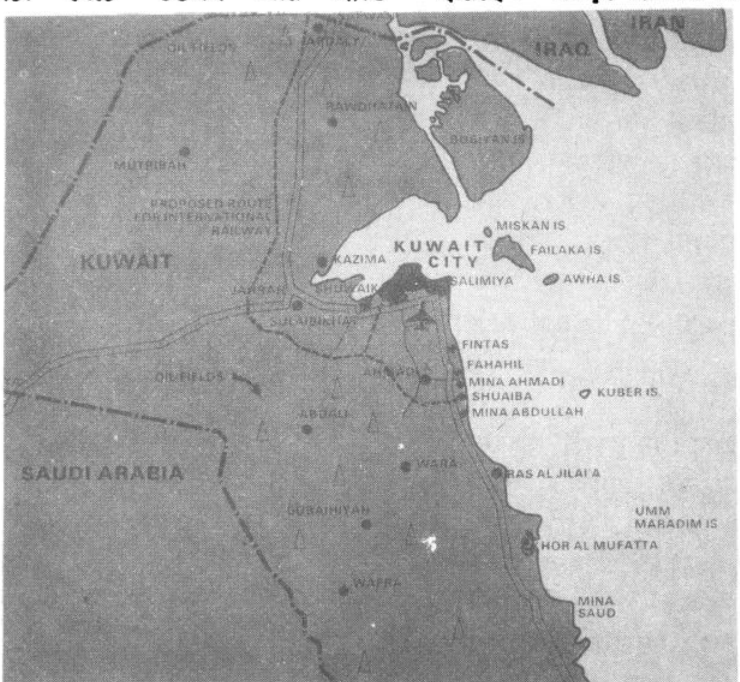

ফুলগুলোর তো কথাই নেই—অর্থাৎ ওদের বাচ্ছারা। যেমন স্বাস্থ্য, তেমনি গোলাপের মত রঙ, গালগুলো আপেল, ঠোঁট ডালিমের দানা আর চোখের তারায় সাগরের টলটলে নীল। ওরা সারা বাগানে প্রজাপতির মত ছুটে ছুটে খেলছে। বাগানে আছে কৃত্রিম পাহাড়, ঝর্ণা, মিনি চিড়িয়াখানা। বড় বড় পার্সিয়ান গালিচা পেতে বসে গেছে এক এক দল, বড় বড় থালায় মেওয়া আর ফল, খাচ্ছে আর গল্প করছে। সঙ্গে আছে বড় বড় হাণ্ডায় দুম্বার মাংস আর খবূজ রুটি।

মূলতঃ কুয়েত ছিল গরীব দেশ। তৈলজাত

হয়ে বসে এরা সারাদিন আড্ডা মারে। মাঝখানে একটা চুল্লি জ্বলে আর ওপরে আংটা ঝোলানো কেটলী থেকে ছোট্ট ছোট্ট কাচের গেলাসে কালো তুর্কী কফি ঢালে আর খায়, সঙ্গে শুকনো মেওয়া আর খেজুর। আমি একদিন সেই কফি একটু মুখে দিয়ে থু থু করে ফেলে দিলাম। কি তেতো রে বাবা!

কুয়েতের ধার ধরে পারস্য উপসাগর এমন এক বাঁক নিয়ে বয়ে চলেছে যে ঠিক মনে হয় একখানা নীলা ও হীরের জড়োয়া হাঁসুলি গহনা গলায় পরে বসে আছে দেশটা। উপসাগরের কূল ঘেঁসে ছোট্ট সবুজ টিলার ওপর পাশাপাশি

দুটি টাওয়ার। টিকিট কেটে বড় টাওয়ারটিতে এলিভেটরে চড়ে সাঁৎ করে ২৩ সেকেণ্ডে আমরা শ তিনেক ফুট উঠে একটা কার্পেট মোড়া কাঁচ ঘেরা গম্বুজ ঘরে গিয়ে ঢুকলাম। ঘরটি সর্বদাই খুব ধীর গতিতে ঘুরছে। এক জায়গায় দাঁড়িয়ে চারপাশের পুরো কুয়েতের একটি ক্ষুদ্র সংস্করণ চোখে পড়ে। অসামান্য সে দৃশ্য! সাগরের নীল জলে ফসফরাসের ঝিলিক, বিশাল সেফ প্রাসাদ (Seif Palace) যেন ছবির মত ছোট্ট মডেল। দীর্ঘ মসৃণ রাস্তাগুলো যেন সাপুড়ের ঝাঁপি থেকে বেরিয়ে পড়া অগুন্তি সাপ —গা এলিয়ে পড়ে আছে। গাড়িগুলো যেন খেলনার, কেউ দম দিয়ে ছেড়ে দিয়েছে, আর মানুষগুলোও যেন নানা রঙের পুতুল। সাগরের বুকে সাদা স্পীডবোটগুলো যেন জলের বুকে ছুটন্ত পাখি। আর পশ্চিম দিগন্তে বিছিয়ে আছে বিশাল মরুভূমির রাজত্ব। আমি মন্ত্রমুগ্ধের মত চেয়ে রইলাম।

আকাশটা হঠাৎই কখন যেন চুমকী বসানো নীলাম্বরীর আঁচল টেনে মুখ ঢাকল। সন্ধ্যা নামল। আমরাও নেমে এলাম। হঠাৎ দেখি সুন্দর ঝলমলে একটা আলোর জাহাজ কখন ভেসে উঠেছে সাগরের বুকে। ওটা নাকি নামী দামী বিলাসবহুল হোটেল। পুরনো জাহাজকে এনে সাজিয়ে গুছিয়ে কি রকম ভোল পাল্টে ফেলেছে। জাহাজ-হোটেলের নাম 'হোটেল ম্যারিয়ট'। সবই ভাল, কিন্তু জলবায়ুটা চরম। পথে ঘুরলেই ঝলসে কাবাব হয়ে যেতে হয়। তেমনি শীতে বাইরে বেরোলে হাড়ে লাগে ঠাণ্ডার কামড়। আমি দুটোরই স্বাদ পেয়েছি।

রামাদান বা রমজানের একমাস কুয়েত আলোর গয়না পরে যা সাজে চোখ ঝলসিয়ে যায়। শেখদের বাড়িগুলো থেকে শুরু করে শহরের অফিস, দোকান, বাজার সেফ প্রাসাদ, রাস্তাঘাট একেবারে আলোয় মোড়া। রাতকে দিন মনে হয়। প্রকাণ্ড মসজিদগুলো এমনিতেই কারুকার্যময়, রামাদানে আলোর ঘটায় তার রূপ দ্বিগুণ হয়। সারাদিনই উপোস থেকে সন্ধ্যা বেলা উপোস ভেঙ্গে সবাই বেরিয়ে পড়ে, সারারাত হৈ হল্লা করে। উপোস ভাঙ্গার আগে যার যেমন সাধ্য দীন দুঃখীকে খাওয়ায় কিংবা দানখয়রাৎ করে। রামাদানের দিন আর একটি চমকপ্রদ দৃশ্য দেখলাম। সোনাবাজার। ছোট ছোট কাচের ঘরে সোনার গয়না সাজানো রয়েছে— বিরাট বিরাট তাদের সাইজ। বিরাট আকৃতির পাঁচ লহর সীতাহার ওদের দশাসই শরীরেই মানায়। দোকানগুলো আলোর গয়না পরে বিদ্যুতের মত ঝলকাচ্ছে। শুনলাম এসব গয়না নাকি কয়েক বছর আগে ফুটপাতে বিক্রী হত।

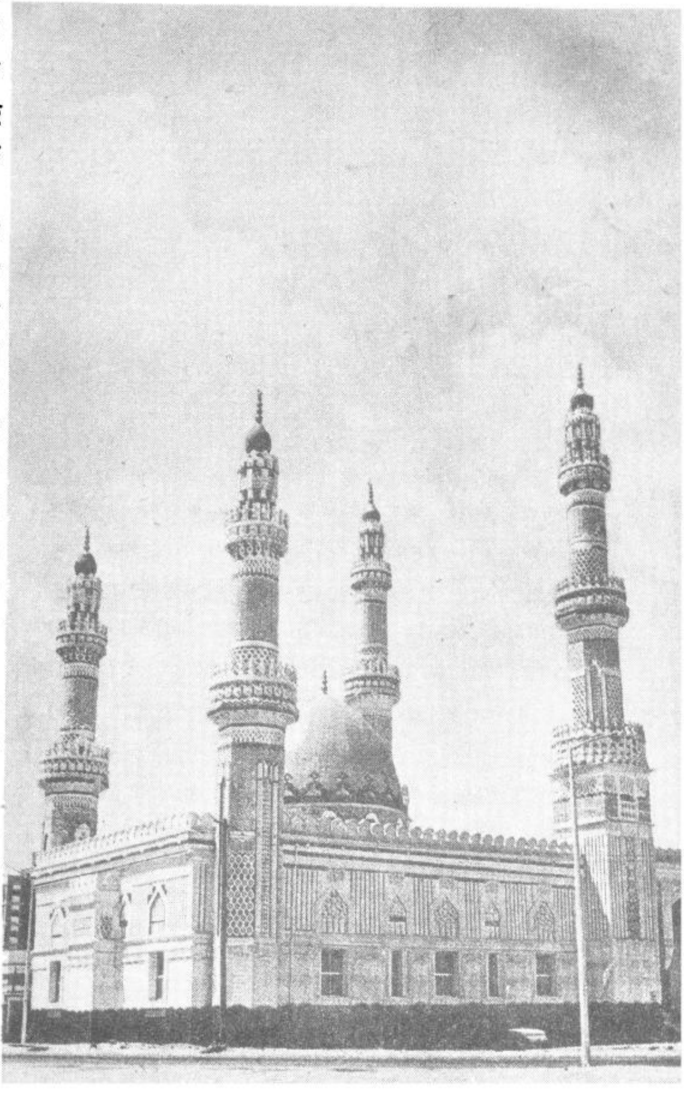

উপসাগরের বুকে আছে ঐতিহাসিক দ্বীপ। ফাইলাক্কা। সেখানে ছবির মত সুন্দর সব কটেজ। দ্বীপটি সম্রাট আলেকজাণ্ডারের আবিষ্কৃত ৩২৬ অব্দে। প্রচুর ঐতিহাসিক ধ্বংসাবশেষ, টেরাকোটা শিল্প নিদর্শন পাওয়া গেছে। সীলমোহর যা পাওয়া গেছে তাতে প্রমাণিত হয় যে চার হাজার বছর আগে এখানে ব্রোঞ্জযুগ ছিল। বিদেশের সঙ্গে ব্যবসা বাণিজ্য চলত। সাগরের কপালে ঝকঝকে টিপের মত এই দ্বীপটিতে সমুদ্রে স্নান করে, মনের সুখে খেয়ে দেয়ে সাগর ও নীল আকাশের সঙ্গে মিতালি পাতিয়ে কটা দিন ভারী ভাল কেটেছিল—স্বপ্নের মত।

মরুভূমির বাসিন্দা বেদুইনদের কথা তোমরা নিশ্চয়ই শুনেছ। ওরা ভেড়ার লোম পাকিয়ে, গাছগাছড়ার ছালপাতার রস থেকে বেশ পাকা রং তৈরি করে, নিজেরাই তাঁত বানিয়ে তাতে যে সব পোষাক, গালিচা, পর্দা তৈরি করে তা দেখলে অবাক হয়ে যাবে। অনেকটা মনিপুরী নাগাল্যাণ্ডের কাপড়চোপড়ের মত। কেমন করে ওরা এসব তৈরি করে তার প্রতিটি নিদর্শন সাজিয়ে রেখেছে শহরে, সাবা বলে একটি বাড়িতে। খুবই লোভনীয়, কিন্তু বড্ড দাম। তবে ওদের সৌন্দর্যবোধে মুগ্ধ হতেই হয়।

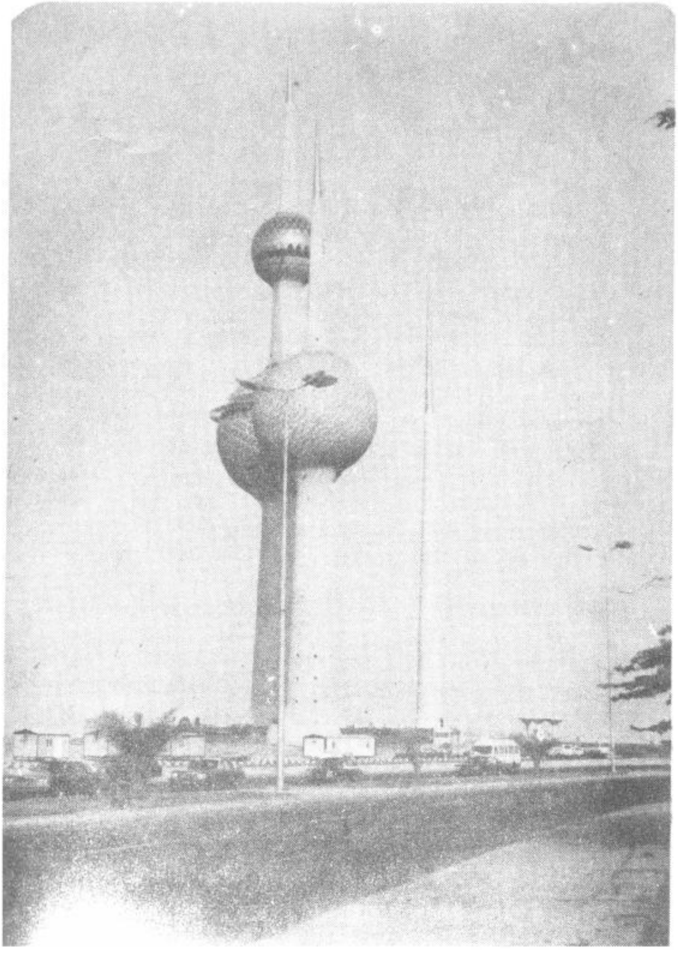

একদিন আমরা আর সঙ্গে আর এক বাচ্ছাকাচ্ছার দল গাড়িতে বেরিয়েছি। বেশ কিছুদূর যাওয়ার পর দূর থেকে দেখি পশ্চিম আকাশটার বেশ খানিকটা জুড়ে লালনীল হলুদ সবুজ সাদা আলোর ভীড়। বেশ কাছে যখন এসেছি, দেখি বড় বড় লালনীল হরফে লেখা KIDS—R—U S। ভেতরে ঢুকে তো আমি অবাক। খেলনার দোকান যে এত বিশাল হতে পারে ভাবতেই পারিনি। একেবারে শিশুর ক্রমশঃ বেড়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে যা যা পোষাক, জিনিসপত্র, খেলনা দরকার তা সব লম্বা লম্বা তাকে সাজানো আছে। কত দেশ বিদেশের কত রকমের যে খেলনা। ধোঁয়া ছাড়া আলো জ্বালা হুইস্‌ল বাজানো চলন্ত ট্রেন, মেশিনগান ছুঁড়লে ধোঁয়া আর আগুনের গোলা বেরোয়। রান্নাঘর, চায়ের সরঞ্জাম—সে সবে ছোটদের দিব্যি পিকনিক হতে পারে। ছোট্ট টাইপ মেশিন, সেলাই কল-এতে ছোট্ট ছোট্ট পুতুলের জামা, রুমাল সব বানানো যায়। এরোপ্লেন, দম দিলেই হু-স করে খানিক উড়ে আসে, লাল হলুদ ক্ষুদে ক্ষুদে বাতি জ্বলছে নিবছে। ছোট ছোট পুতুল প্যাসেঞ্জার বসিয়ে দাও তো আরো মজা। ছোট ছোট কটেজ, বাগানওয়ালা দোতলা বাড়ি, তার ভেতর প্রতিটি কামরা আসবাব পত্র সমেত সাজানো। দরজা জানালায় সুন্দর লেসের পর্দা। বসার ঘরটি মিনি সোফাসেট, টিভি টেলিফোন, ফুলশুদ্ধ ফুলদানী দিয়ে সাজানো।

হঠাৎ বাচ্ছাদের কোলাহলে মুখ ফিরিয়ে

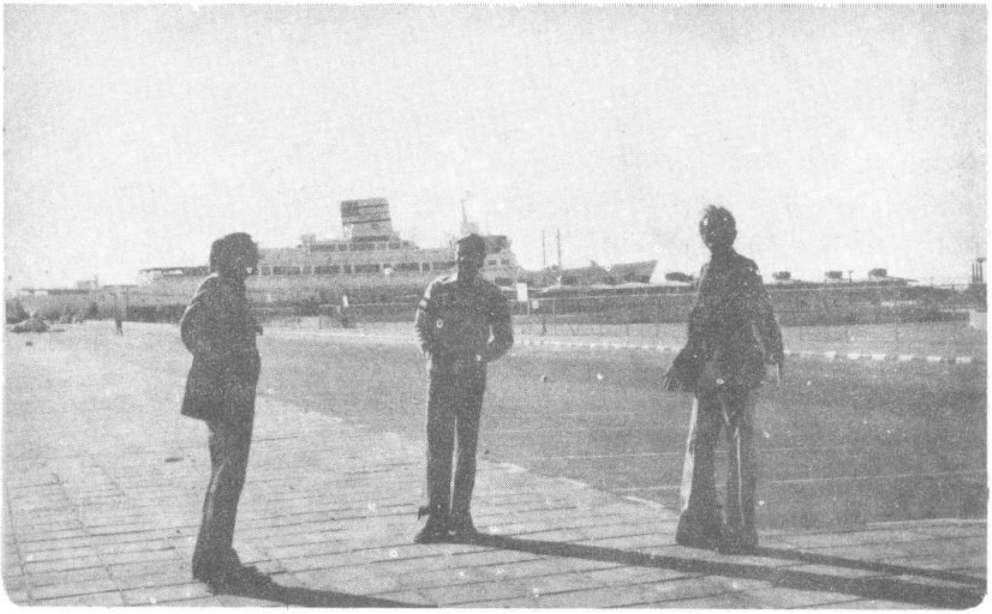

দেখি KIDS—R—US এসে হাজির। বিরাট এক টেডি বেয়ার (ভেতরে মানুষ) হেলে দুলে বাচ্ছাদের সঙ্গে কথা বলছে। অতি সাহসী যারা তারা তার ভুঁড়ো নাদুস নুদুস পেটটায় কিল মেরে হাত টেনে গা খুঁচিয়ে বিরক্ত করে মজা করছে, আর ভীতুর দল তাদের মা বাবাকে আঁকড়ে চ্যাঁ ভ্যাঁ লাগিয়ে দিয়েছে। এই ভালুক বাবাজী দোকান বন্ধ হবার আগে এসে সকলকে গুডনাইট জানিয়ে যায়।

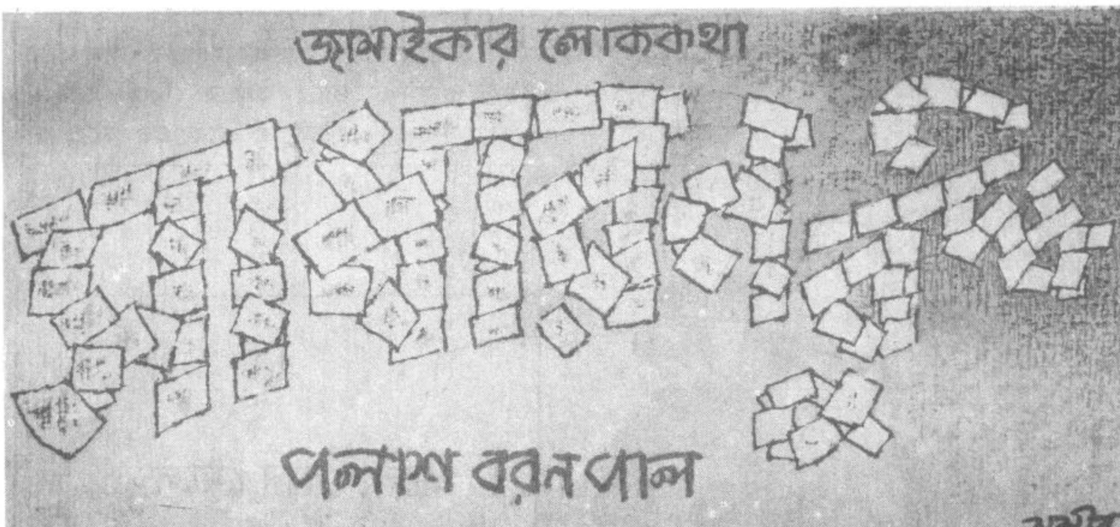

অনেকদিন আগেকার কথা বলছি। কোন্ গ্রামে ঘটেছিলো ঘটনাটা তা জানবার কোনো দরকার নেই। শুধু এইটুকু জানলেই চলবে যে যাকে নিয়ে আমাদের গল্প সেই লোকটার নাম আনান্‌সি। আনান্‌সি কিনা বড়ো বুদ্ধিমান, আর গাঁয়ের অন্য সবাই বোকা। আনান্‌সির কাছে এ-কাজে সে-কাজে বুদ্ধি চাইতে আসে তারা। আনান্‌সি তাই ঠিক করলো, দুনিয়ার যতো যা সাধারণ বুদ্ধি আছে, তা জড়ো করে রাখবে একটা থলেতে। থলেটা ওরই কাছে থাকবে, তাহলে সমস্ত সাধারণ বুদ্ধিও হবে ওরই। অন্যরা তার ভাগ চাইতে এলে পয়সা নেবে আনান্‌সি—প্রচুর লাভ হবে তার।

যে কথা সেই কাজ। বিশাল একটা থলে জোগাড় করলো আনান্‌সি, তারপর যখনই যা টুকিটাকি সাধারণ বুদ্ধি মাথায় আসে তার, সব এক এক টুকরো ছোট্টো কাগজে লিখে সেই থলের মধ্যে রেখে দেয়।

এমনি করে থলে বোঝাই হলো। শেষ অবধি একদিন আনান্‌সির মনে হলো--সমস্ত সাধারণ বুদ্ধিই জোগাড় করা হয়েছে, কাজ শেষ। এবার থলেটার মুখ বন্ধ করে থলেটাকে একটা উঁচু গাছের ডালে লুকিয়ে রেখে আসতে হবে, যাতে আর কেউ তার সন্ধান না পায়।

কিন্তু সেই বিশাল থলে নিয়ে গাছে ওঠা কি চাট্টিখানি কাজ! হাতে ধরে ওঠার তো প্রশ্নই ওঠেনা। আনান্‌সি তাই দড়ি বেঁধে গলায় ঝোলালো থলেটাকে। তারপর লম্বা একটা গাছ বেছে উঠতে শুরু করলো।

এ-কাজটা তেমন সহজ নয়। গাছে উঠতে গেলে হাত দিয়ে আঁকড়ে ধরতে হবে গাছের গুঁড়িটাকে। কিন্তু সামনে ঝুলছে বুদ্ধিবোঝাই থলে, তার জন্য ধরাও যাচ্ছেনা ভালোমতো। রীতিমতো নাকের জলে চোখের জলে অবস্থা আনান্‌সির।

গাছের ওপর ফল পাড়তে উঠেছিলো দুটো বাচ্চা ছেলে। আনান্‌সির অবস্থা দেখে তারা হেসে বাঁচেনা। একজন আরেকজনকে—'দ্যাখ্ দ্যাখ্, লোকটা কি বোকা! থলেটা পিঠের দিকে ঝোলালেই তো ল্যাঠা চুকে যায়।'

কথাটা পরিষ্কার কানে গেলো আনান্‌সির! হায় হায়, এতোদিন ধরে এতো সাধারণ বুদ্ধি সংগ্রহ করেছে সে, কিন্তু তার মধ্যে তো কোথাও এ-কথা লেখেনি যে থলে নিয়ে গাছে উঠতে হলে

থলেটা পিঠের দিকে ঝোলাতে হয়!—হতাশায়, রাগে, বিরক্তিতে আগুন ধরে গেলো তার মাথায়। 'এতোকালের এতো কষ্টের সঞ্চয়, তবু তার মধ্যে সমস্ত সাধারণ বুদ্ধির কথা তো নেই।'

রগের চোটে থলেটা ছিঁড়ে ফেললো আনান্সি ছড়িয়ে গেলো কাগজগুলো। ঠিক সেই সময়ে হাওয়া এলো, উড়িয়ে নিয়ে গেলো সেই কাগজ সর্বত্র। নানান্ জায়গার লোকে কুড়িয়ে পেলো কাগজের টুকরো কেউ একটা, কেউ দুটো, কেউ তিনটে।

সেই থেকে সব লোকেরই সাধারণ বুদ্ধি হলো একটু আধটু। তবে একটা কথা। সব বুদ্ধি কেউই পায়নি। তাতে লজ্জার কিছু নেই। কোনো সমস্যায় পড়লে এ ওকে প্রশ্ন করে, ও একে।

এলো কোন্ মেলে

চুনী দাশ

দশ-ই মে-র চিঠিখানা
পাঁচ-ই মে-তে পেলে
সকলেরই মনে হবে
এলো কোন্ মেলে !

আরে, আরে, পেয়ে গেছি
'সীলমারা' সাল
তিন সন আগে লেখা
এলো গতকাল !!

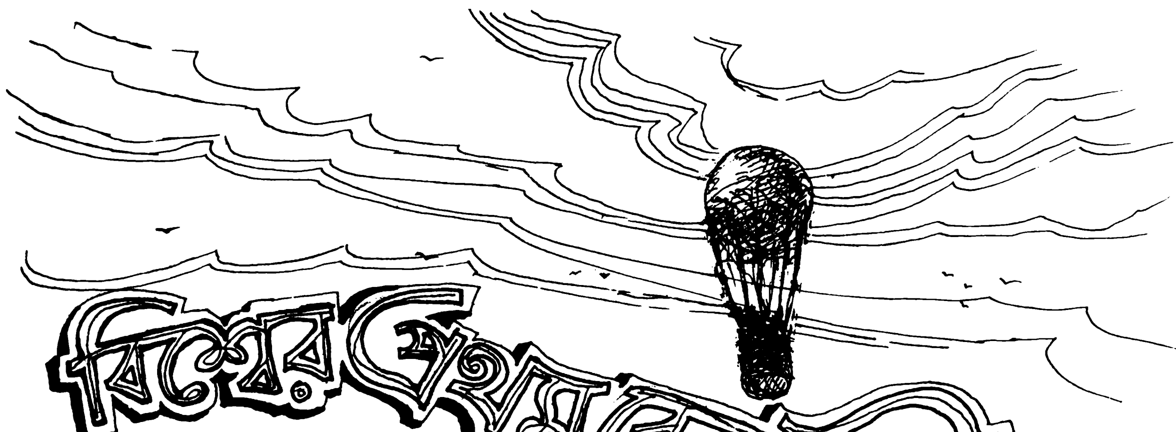

বিশ্বের প্রথম বেলুন যাত্রা

তাপস কুমার

দুই ভাই—উইলবার রাইট এবং অরভিল রাইট তো এরোপ্লেন আবিষ্কার করলেন এই সেদিন—১৯০৭ সাল নাগাদ। তারপর আকাশপথে ভ্রমণের জন্য আকাশযান গুলোর কত উন্নতিই না হয়েছে। রকেট আবিষ্কার হয়েছে। তাতে চড়ে মানুষ পৃথিবীর সীমানা ছাড়িয়ে দূর দূরান্তের গ্রহ-নক্ষত্রে পাড়ি জমাচ্ছে।

এই মাটি ছেড়ে আকাশে ওঠার স্বপ্ন মানুষ কবে থেকে দেখতে শুরু করে জানো? সে প্রায় ১৭০০ সালের গোড়ার দিক থেকে। বহু চেষ্টা বহু অসাফল্যের পর প্রথম সাফল্য এল ১৭৮৩ খৃষ্টাব্দে। ফরাসী দেশে দুই ভাই বাস করত। জোসেফ মঁগোলফিয়ে এবং স্টিফেন মঁগোলফিয়ে। তাদের কাজ ছিল কাগজ তৈরী করা। ফরাসী দেশেই বেলুনের উৎপত্তি এবং বেলুনের সাহায্যে আকাশ-বিহার করার পদ্ধতি সেই দেশেই মাত্র অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষে আবিষ্কৃত হয়। বেলুন কথাটাও ফরাসী কথা। সেই সময় ফরাসী রসায়নিকগণ ফানুসের মত দেখতে এক রকম কাঁচের যন্ত্র ব্যবহার করতেন—তার নাম ছিল বেলুন। ঠিক তারই মত গঠন বলে ফানুসেরও নাম হয়, বেলুন

প্রথম প্রথম পরীক্ষা হতে লাগল, শুধু বেলুন কতক্ষণ ওপরে থাকতে পারে? এই সময় একবার একটি বেলুন পুড়ে গিয়ে এক গ্রামে কৃষকদের ক্ষেতে এসে পড়ে। ক্ষেতের চারদিকে যে-সব কৃষকেরা কাজ করছিল, তারা মনে করল আকাশ থেকে নিশ্চই কোন ভয়াবহ জন্তু এসে পড়েছে। শাবল, কোদাল, লাঠি—যে যা পারল তাই নিয়ে প্রস্তুত হল। একজন বাড়ী থেকে বন্দুক নিয়ে আসল। সশস্ত্র হয়ে তখন সকলে মিলে একযোগে আকাশ থেকে আসা সেই জন্তুটিকে আক্রমন করল। যখন দেখল, জন্তুটি আর্তনাদও করে না, এক ফোঁটা রক্তও পড়ে না, তখন বিস্ময়ে আকাশের দিকে চেয়ে আরো শঙ্কিত হয়ে উঠল, বুঝি বা তবে ভূত প্রেতের ব্যাপারই হবে!

এ ঘটনার কথা জেনে ফরাসী গভর্নমেণ্ট গ্রামে গ্রামে ঘোষণা করে দিলেন যে, এটা কোন জন্তু নয়, মানুষেরই তৈরি করা এক রকম জিনিস, এর সাহায্যে মানুষ আকাশে ওঠার চেষ্টা করছে।

এবার যাঁরা বেলুন তৈরী করেছিলেন, তাঁদের সমস্যা হল—বেলুন তো হল, বেলুনে করে আকাশে উঠবে কে?

প্রথমে স্থির হল যে, কতকগুলি জন্তুকে দিয়ে আগে পরীক্ষা করে দেখা যাক। ফ্রান্সের রাজা, রাজসভাসদ এবং জনসাধারণের সামনে মঁগোলফিয়ে ভাইয়েরা বেলুন ছাড়লেন। বেলুনের সঙ্গে একটা বড় ঝুড়ির মত জিনিস ঝুলিয়ে দেওয়া হল। সেই ঝুড়িতে একটি মোরগ, একটি হাঁস এবং একটি ছাগলকে উঠিয়ে দেওয়া হল। সেই তিনটি ইতর প্রাণীই হল জগতের

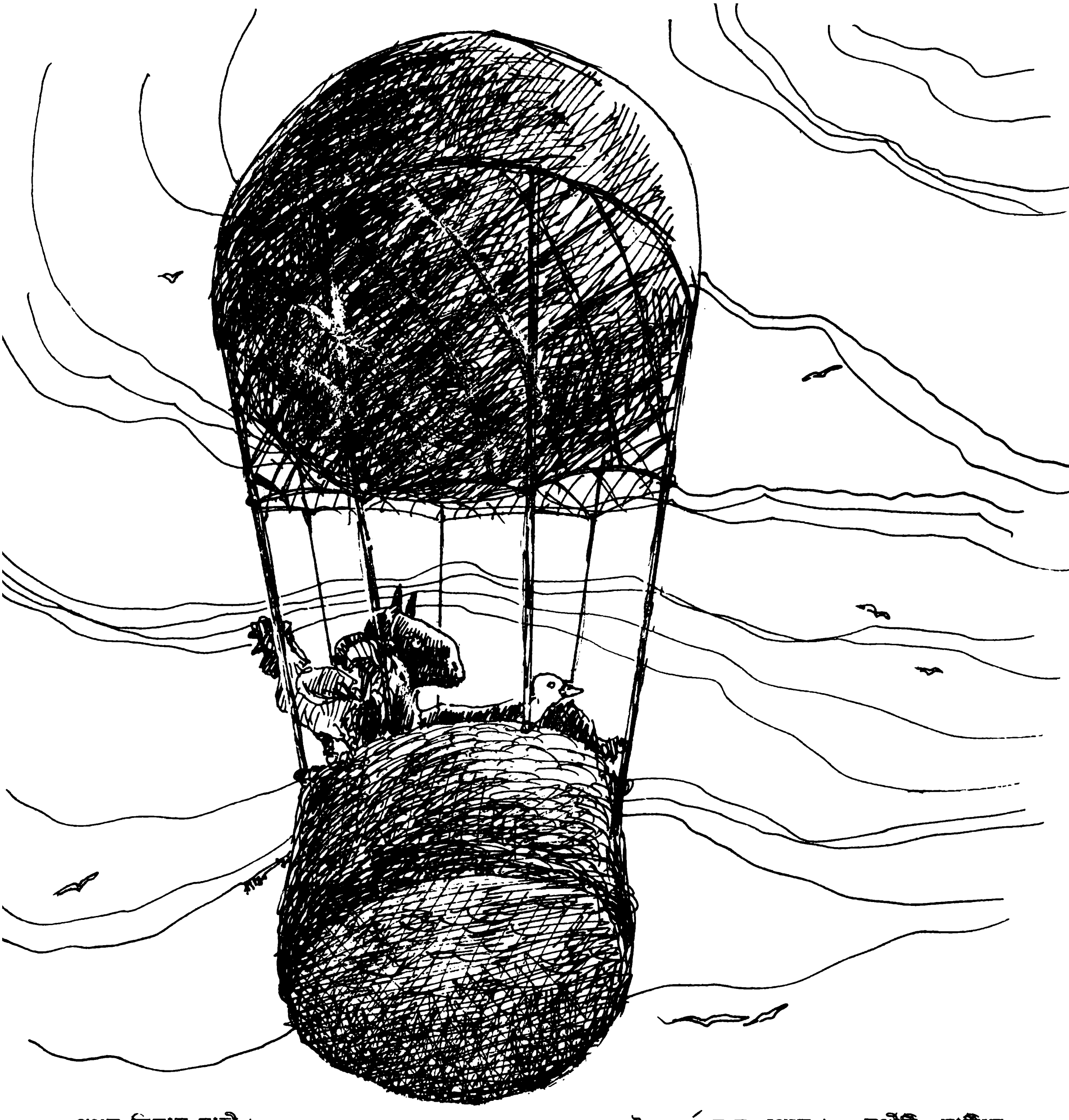

প্রথম বিমান যাত্রী।

বিপুল জয়ধ্বনির মধ্যে, বেলুন আকাশে উঠল।

কেউ বলতে লাগল, একটু ওপরে উঠলেই জন্তুগুলি দম আটকে মরে যাবে, কেউ অনুমান করল, ওপরে নিশ্চয় খুব ঠাণ্ডা—ঠাণ্ডায় তারা জমে যাবে; কেউ ভাবল, নিশ্চই ছিটকে পড়ে যাবে।

বেলুনটি যখন নির্বিঘ্নে মাটিতে নেমে এল, সকলে অবাক হয়ে দেখল—তাদের সকলের অনুমানই ব্যর্থ হয়ে গেছে। মুর্গীটি মাটিতে নেমেই বিস্ময়ে কয়েকবার ডেকে উঠল; ছাগলটি তখনও ঘাস চিবোচ্ছিল আর হাঁসটি ঘাড় দুলিয়ে যেন বলল—পুকুর কোথায়! আমি যে সাঁতার কাটব।

এই ঘটনার পর ঠিক হল যে, এইবার বেলুনে কোন মানুষকে যেতে হবে। কিন্তু যাবেটা কে? মৃত্যুর হাতে নিজেকে স্বেচ্ছায় তুলে দেবে কে? মাটির ওপর মানুষ সাহস করে বহু কাজ করতে পারে। কিন্তু আকাশে

সে একেবারে অসহায়। সেখানকার আবহাওয়া, অবস্থা সম্বন্ধে তখনও পর্যন্ত মানুষের বিশেষ অভিজ্ঞতা জন্মায়নি। অথচ সমস্যা হল যে, মাটিতে থেকে আকাশের বায়ুমণ্ডলের অবস্থা বোঝার কোন উপায় নেই। বায়ুমণ্ডলের অবস্থা বুঝতে হলে, প্রকৃত বায়ুস্তরের মধ্যে বিচরণ করে সেই জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে হবে। কে প্রথম এই দুরূহ সাধনায় আত্মসমর্পন করবে? অনেক জল্পনা-কল্পনার পর ঠিক হল—মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত দু'জন বন্দীকে পাঠানো হোক। তারা তো এমনিই মরত, সুতরাং তাদের ওপর দিয়েই পরীক্ষা করা যাক।

কিন্তু এক শ্রেণীর লোক এই প্রস্তাব শুনে ক্ষুন্ন এবং বিরক্ত হলেন। তাঁরা বললেন, মানুষের অগ্রগতির এত বড় একটা আবিষ্কারের প্রথম পরীক্ষার সঙ্গে দু'জন মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত কলঙ্কিত লোকের নাম ইতিহাসে অমর হয়ে থাকবে, আর আমরা ভীত শঙ্কিত হয়ে ঘরে বসে থাকব, তা কখনই হতে পারে না! যে-মানুষ আকাশ-জয় করতে বের হয়েছে, তার পক্ষে মৃত্যু ভয় সাজে না!

পিলাত্র দ্য রোজিয়ে নামে একজন দুঃসাহসী ফরাসী ঘোষণা করলেন যে, বেলুনে উঠে তিনিই প্রথম আকাশ-পরিভ্রমণে যাবেন। তাঁর বন্ধু মারফি দারলাঁদ তাঁর সঙ্গে যেতে সম্মত হলেন।

১৭৮৩ খৃষ্টাব্দের ২১শে নভেম্বর পারী নগরীতে বহু দর্শক ও রাজদম্পতির সামনে দু'জন বন্ধু নিজেদের তৈরী বেলুনে উড়লেন আকাশে।

আধ ঘণ্টা পর প্রায় ৮ কিলোমিটারে পথ অতিক্রম ক'রে তাঁদের বেলুন মাটিতে নেমে এল এবং সম্পূর্ণ নির্বিঘ্নে তাঁরা দু'জন আবার মাটিতে এসে দাঁড়ালেন। এই ঘটনার পর থেকে বেলুনে আকাশ-বিহার করতে মানুষের ভয় কেটে গেল।

রোজিয়ে ঠিক করলেন যে, বেলুনে চড়ে ফ্রান্স থেকে ইংলণ্ডে যাবেন। ফ্রান্স এবং ইংলণ্ডের মাঝখানে ইংলিশ চ্যানেলের বিশাল জলরাশি। রোজিয়ে-র এই সংকল্পের কথা শুনে লোকে শিউরে উঠল দুঃসাহসী এই লোকটির ভাগ্যের কথা ভেবে।

তখন হাইড্রোজেন গ্যাস সবেমাত্র আবিষ্কৃত হয়েছে। খুব হালকা বলে এই গ্যাস বেলুনে পুরে তিনি যাত্রা করলেন। কিন্তু সহজদাহ্য এই গ্যাসের অপরাপর প্রকৃতি সম্বন্ধে তখনও সবকিছু জানা যায় নি।

রোজিয়ে-র বেলুন বায়ুর টানে ফ্রান্সের উপকূল ত্যাগ করে ইংলণ্ডের দিকে চলল। ফলাফল জানার জন্য ইংলিশ চ্যানেলের দু'পারে হাজার হাজার লোক উৎকণ্ঠায় অপেক্ষা করতে লাগল।

বেলুন অনেকটা উঁচুতে উঠল। কিছুক্ষণ পরে হঠাৎ আকাশে এক ভীষণ শব্দ। সেই শব্দের সঙ্গে সঙ্গে দেখা গেল, রোজিয়ে-র বেলুন দাউ দাউ করে জ্বলছে।

অনুসন্ধানের পর যখন রোজিয়ে-র দেহ খুঁজে পাওয়া গেল, তখন কঠিন মাটির স্পর্শে তা থেঁতলে জড়পিণ্ড হয়ে গেছে। আকাশকে জয় করার সাধনায় রোজিয়ে হলেন প্রথম বলি।

কিন্তু এই ভয়াবহ দুর্ঘটনার পর যে মানুষ ভীত হয়ে আকাশে আকাশে ওড়ার চেষ্টা ছেড়ে দিল, তা নয়—বরং সে আরও বিপুল উদ্যমে আকাশ জয় করার সাধনায় আত্মনিয়োগ করল। শুধু আত্মনিয়োগ নয়, বহু লোককে আত্মদানও করতে হয়েছে। আজ আকাশের যে পথ দিয়ে যন্ত্রচালিত এরোপ্লেন, জেটপ্লেন, রকেটগুলো হস্ হস্ করে উড়ে যায়, সেই পথের চারদিকে শূন্যমণ্ডলে রোজিয়ে-র মতই বহু দুঃসাহসী আকাশ-পথের পথিকের শেষ আর্তনাদ মিশে আছে।

শ্যামকান্ত

রাধিকারঞ্জন চক্রবর্তী

সে অনেকদিন আগেকার কথা। বাংলার এক বিখ্যাত মল্লবীর এসেছেন আগরতলায়। খবরটা চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল। একসময় সরকারী আমলাদের কানে গিয়েও পৌঁছুল।···

খবর পেয়ে রাজ্যের এক মন্ত্রীমশাই মল্লবীরের সাথে দেখা করতে এলেন। লোকটা তাঁর অতি পরিচিত। বেশ কয়েক বছর আগে ত্রিপুরার রাজা মশাইয়ের দেহরক্ষী হিসেবে কাজ করেছিলেন। অবশ্য তখন তিনি একজন সাধারণ ব্যায়ামবীর হিসেবে পরিচিত ছিলেন। দেশজোড়া খ্যাতি অর্জন করেন নি।··

মাত্র কয়েক বছরের ব্যবধানে কত ঘটনা ঘটে গেছে। ধাপে ধাপে খ্যাতির উঁচু চূড়ায় উঠেছেন মল্লবীর। সামান্য দেহরক্ষী থেকে বরিশাল সরকারী স্কুলে ব্যায়াম শিক্ষক এবং সেখান থেকে একটা সার্কাস দলের দলপতি। সে এক রীতিমত বড় সার্কাস দল। নাম, 'উইলসন সার্কাস'। সে যুগে ঐ সার্কাসের যথেষ্ট নাম ডাক ছিল। সার্কাসের কাজে প্রায় আঠারোশো টাকা মাইনে ছিল মল্লবীরের। তখনকার দিনে এই টাকার অংকটা কম নয়।···

সার্কাস দলে শারীরিক খেলার সঙ্গে আরও একটা খেলা দেখাতেন মল্লবীর। সেটা বাঘের সাথে লড়াই। প্রাণপণ লড়াই করেও বাঘ কোন সময় তাঁর সঙ্গে পেরে উঠত না। শেষে হার স্বীকার করে লজ্জায় লেজ-গুটিয়ে খাঁচার মধ্যে ঢুকে পড়ত। খেলাটি দেখে দর্শকেরা প্রতিবার তুমুল করতালি দিয়ে মল্লবীরকে অভিনন্দন জানাত।···

একবার জয়দেবপুরের রাজা সার্কাসের খেলা দেখতে এসে বাঘের সঙ্গে মানুষের খেলাটি দেখে রীতিমত অবাক হয়েছিলেন। মল্লবীরের শক্তি ও সাহস দেখে তাঁকে বাহাবা জানিয়ে তখনই একটা পুরস্কার ঘোষণা করেছিলেন। সেই পুরস্কার অন্য কিছু নয়,—একটা জলজ্যান্ত রয়েল বেঙ্গল টাইগার! পুরস্কারটা একদিন সসম্মানে গ্রহণ ক'রে মল্লবীর সেটি নিজের কাছে রাখেননি; সার্কাস দলে জমা রেখেছিলেন। অনেকদিন সেই বাঘের সঙ্গে লড়াইয়ের খেলা দেখিয়ে দর্শকের প্রশংসা পেয়েছেন। সাহস ও বীরত্বের খেলা দেখে দর্শকেরা প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে তাঁর জয়ধ্বনি করেছে। সেই জয়ধ্বনি ক্রমশঃ দূর বিস্তৃত হয়ে একদিন সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়েছে।···

তবে দীর্ঘদিন সার্কাসে চাকরি করেন নি মল্লবীর। পরের চাকরি তাঁর ভাল লাগেনি। তাই একসময় চাকরিটা ছেড়ে দিয়ে নিজে একটা সার্কাস দল গঠন করেছিলেন। সে আর এক কাহিনী।···

এই বাঙালি মল্লবীরের নাম শ্যামাকান্ত বন্দোপাধ্যায়। ঢাকা জেলার বিক্রমপুরে তাঁর জন্ম। ছেলেবেলা থেকেই ব্যায়ামে তার আসক্তি

ছিল। আজীবন উজ্জ্বল স্বাস্থ্যের অধিকারী ছিলেন তিনি। দেহে ছিল অসাধারণ শক্তি, মনে দুর্বার সাহস। সেই সঙ্গে আরও একটি গুণ ছিল,—সেটি তাঁর প্রখর বুদ্ধি। বুদ্ধির ভেলকি দেখিয়ে যে কোন জটিল কাজ তিনি অনায়াসে সম্পন্ন করতেন। হিংস্র বাঘ ভালুকও তাঁর বুদ্ধির মারপ্যাঁচে পড়ে সহজে পরাস্ত হত। কত বুদ্ধিমান লোক বুদ্ধির চমকে নিজেদের সাময়িক বুদ্ধি গুলিয়ে ফেলত। এ সম্পর্কে কয়েকটি কাহিনী আছে।···

আগরতলায় এসে শ্যামাকান্ত একটা আলাদা বাসা ভাড়া করলেন। চেনাশুনা থাকলেও পরের বাসায় থাকা অনেক অসুবিধে। তাছাড়া সঙ্গে অনেক জিনিসপত্তর আছে।···

মন্ত্রীমশাই সেদিন মল্লবীরের দরজায় এসে কড়া নাড়তেই একটা বাঘের গর্জন শুনে থমকে দাঁড়ালেন। তারপর ঘরের একটা খোলা জানালায় মুখ বাড়াতেই যা দেখলেন, তাতে তাঁর শরীরের রক্ত শুকিয়ে যাবার উপক্রম। ভয়ে সমস্ত শরীরটা কাঁপতে সুরু করল! পা দু'টো ক্রমশ অবশ হয়ে পড়ল। মন্ত্রী মশাই দেখলেন ঘরের মধ্যে একটা চিতা বাঘ যন্ত্রণায় ছটফট করছে। তার চোয়াল দুটো পায়ের চাপে ফাঁক ক'রে মল্লবীর শ্যামাকান্ত কি যেন করছেন। বাঘটার মুখের মধ্যে তার একটা হাত ঢোকানো। সমস্ত শরীরে দর দর করে ক'রে ঘাম করছে। যন্ত্রণায় বাঘটা থেকে থেকে হুঙ্কার দিচ্ছে। কয়েক পা পিছিয়ে এসে জানালায় চোখ রেখে মন্ত্রী মশাই সভয়ে সেই দৃশ্য দেখতে লাগলেন।

মন্ত্রী মশাই কতক্ষণ দাঁড়িয়েছিলেন খেয়াল ছিল না। হঠাৎ শ্যামাকান্তের ডাকে তাঁর সম্বিৎ ফিরে এল। বাইরে বেরিয়ে এসে শ্যামাকান্ত তা'কে সাদরে অভ্যর্থনা ক'রে বলছেন, 'আরে আসুন, ঘরে আসুন মন্ত্রীমশাই। কি সৌভাগ্য! কতদিন পর দেখা।···' মন্ত্রীমশাই ততক্ষণে মনে মনে কিছুটা সাহস পেয়েছেন। ঢোঁক গিলে কোনরকমে উত্তর দিলেন, —'না মানে, আপনি এসেছেন খবর পেয়ে দেখা করতে এলাম।'

—'বেশ করেছেন। তা কতক্ষণ এসেছেন?'

—'বেশীক্ষণ নয়, মিনিট দশেক হবে।'

—'মিনিট দশেক? এতক্ষণ বাইরে দাঁড়িয়ে ছিলেন! নামটা ত জানা ছিল, জোরে হাঁক পাড়লেই বেরিয়ে আসতাম।'

কথাগুলো বলতে ঘরের দিকে এগিয়ে চললেন শ্যামাকান্ত। মন্ত্রী মশাই তাঁর পিছু পিছু এগুলেন। ঘরের চৌকাঠে দাঁড়িয়ে মুখ বাড়িয়ে সভয়ে ঘরের ভেতরটা একবার চোখ বুলিয়ে নিলেন। হঠাৎ সেদিকে চোখ পড়তেই শ্যামাকান্ত সজোরে হেসে উঠলেন। হাসতে হাসতে বললেন, এতক্ষণ বাইরে জানালার ধারে দাঁড়িয়ে বাঘে-মানুষে লড়াই দেখছিলেন বুঝি? তাই আপনার শরীরে একটা আড়ষ্ট ভাব লক্ষ্য করছি। এখনও সেই ভাব পুরোপুরি কাটেনি। কোন ভয় নেই, ঘরে এসে বসুন। ওটা পোষা বাঘ, কোন ক্ষতি করবেনা। মাস কয়েক আগে ওটাকে কিনেছি। রোজ ওকে খেলা শেখাই। অবশ্য সঙ্গে আরও একটা জন্তু আছে। সেটা ভাল জাতের এক কুকুর। রীতিমত লড়িয়ে কুকুর। ঘরে বাইরে সব সময় কুকুরটা আমার সঙ্গে থাকে।···থাক, সেকথা। এখন আপনার খবর কি বলুন?'

মন্ত্রী মশাই ততক্ষণে ঘরে ঢুকে আসন গ্রহণ করেছেন। মনে খানিকটা স্বস্তি ফিরে পেয়েছেন। এবার মল্লবীরের প্রশ্নটি শুনে বললেন, 'মোটামুটি ভালই। আপনার খবর কি বলুন? খবরের কাগজে প্রায় আপনার বীরত্বের কথা পড়ি। বাঘের সঙ্গে লড়াইয়ের খেলা দেখিয়ে বাজীমাৎ করেছেন। সর্ব্বত্র আপনার জয় জয়াকার। উইলসন্ সার্কাসে আপনার জুড়ি নেই।'

'কিছুদিন হল, সার্কাসের চাকরিটা ছেড়ে দিয়েছি।'

—'সে কি? মোটা মাইনের চাকরিটা শেষ পর্যন্ত ছেড়ে দিলেন?'

'হ্যাঁ, চাকরি আর ভাল লাগলনা। তাই এখন নিজেই একটা দল করেছি। নানা জায়গায় খেলা দেখিয়ে বেড়াই। তবে ভাল একটা সার্কাস দল গড়ে তোলা সহজ ব্যাপার নয়। অনেক টাকার দরকার। আমার সেই টাকা নেই।'

—'এখানে খেলা দেখাবেন?'

—হ্যাঁ, সেইরকমই ইচ্ছে। শুনলাম, ত্রিপুরার মহারাজা আগরতলায় রয়েছেন। তাঁকে বাঘের খেলাটা দেখাব।

—'কিন্তু মহারাজা এখন খুব ব্যস্ত। কারো সঙ্গে দেখা করছেন না। কয়েকজন বিদেশী তাঁর সঙ্গে দেখা করার জন্যে কয়েকদিন থেকে অপেক্ষা করছেন। মহারাজ ভদ্রতার সঙ্গে কেবলই সাক্ষাতের দিন পিছিয়ে দিচ্ছেন। হয়ত আপনাকেও কয়েকদিন অপেক্ষা করতে হবে।'

—'সে দেখা যাবে। অন্যদের মত আমি এখানে বেশীদিন বসে থাকবনা। যদি পারি, আগামীকাল মহারাজের সঙ্গে দেখা করে খেলাটা দেখিয়ে আসব।'

'দেখুন, চেষ্টা করে। তবে এখানে আপনার অনেক লোক জন থাকতে ভাড়াটে বাড়িতে উঠলেন কেন?'

—'না ভাই, পরের বাসায় উঠে কতকগুলো ভাত আর মিষ্টি খেয়ে পেট মোটা করার লোক আমি নই। তাছাড়া সঙ্গে একটা বাঘ আছে। আমার কাছে আসার আগে সে নরমাংস খেয়ে জীবন ধারণ করত। এখন তাকে সেরকম আতিথ্য করবে কে? তাছাড়া একটা কুকুরও আছে। তারও ভরণ পোষণের খরচ আছে।'

—'তাহলে চলছে কি করে?'

রোজ বড় দেখে একটা ছাগল কিনে আনি। তার অর্দ্ধেকটা বাঘকে খাওয়াই। বাকীটা উনুনে আধসিদ্ধ ক'রে নিজে খাই আর কিছুটা

কুকুরকে দিই। শাক সবজী দিয়ে দু'টো ভাত আমার না খেলেও চলে।'

কথাগুলো শুনে মন্ত্রী মশাই অবাক হয়ে মল্লবীরের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন। তারপর বিদায় নিয়ে সেখান থেকে প্রস্থান করলেন।

পরদিন সকালে মল্লবীর শ্যামাকান্ত সঙ্গে তাঁর বাঘ ও কুকুরকে নিয়ে মহারাজার প্রাসাদে উপস্থিত হলেন। প্রাসাদের প্রবেশমুখে কয়েকজন মণিপুরী সৈনিক পাহাড়া দিচ্ছে। মল্লবীরকে তারা বাধা দিল; কিন্তু তাদের সমস্ত বাধা উপেক্ষা ক'রে তিনি সোজা এগিয়ে চললেন। অন্দর মহলে ঢুকতেই একটা সিঁড়ি। সিঁড়ির মুখে কয়েকজন সশস্ত্র প্রহরী। তারা বাধা দিয়ে বলল, 'মহারাজ ব্যস্ত। এখন তিনি কারো সাথে দেখা করবেন না।' শ্যামাকান্ত তাদের কথাগুলো যেন শুনেও শুনলেন না। আপন মনে সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠতে লাগলেন। সশস্ত্র প্রহরীরা তখুনি ছুটে এসে তাঁকে আর একবার বাধা দিল। তিনি অনায়াসে তাদের অস্ত্রগুলো কেড়ে নিলেন। তখনই একটা ভীষণ গোলমাল আরম্ভ হল। চীৎকার চেঁচামেচিতে বাড়ির লোকজনেরা অস্থির হয়ে উঠল। কুকুরটাও সেই সুযোগে চীৎকার শুরু করে দিল। গোলমাল শুনে মহারাজা তখুনি নিচে লোক পাঠিয়ে খবর নিলেন। খবরটা শুনে তিনি মুহূর্তে অস্থির হয়ে পড়লেন। সংগে সংগে মন্ত্রীমশাইকে ডেকে বললেন, 'আরে, করেছেন কি? শ্যামাকান্তকে কখনো ঠেকিয়ে রাখা যায়? আমিও ওকে ভয়ে এড়িয়ে চলি। ওকে বাধা দেবেন না, আমার কাছে আসতে দিন।'

মহারাজার কাছে উপস্থিত হয়ে শ্যামাকান্ত বললেন, 'মহারাজ, আমি বাঘের মুখে হাত ঢুকিয়ে সেই হাত অক্ষত অবস্থায় ফিরিয়ে আনতে শিখেছি! নরখাদক হিংস্র বাঘকে পোষ মানিয়েছি। আপনাকে আজ সেই খেলা দেখাতে এসেছি,—আদেশ করুন।'

মহারাজ বললেন, 'দেখ বাপু, আমি জানি তোমার শক্তি ও সাহস দুই আছে। তবে বাঘের খেলা আমি দেখতে চাইনা। কখন কি অঘটন ঘটে, বলা যায় না। সাত সকালে বাঘের মুখে ব্রহ্মহত্যা দেখতে আমি কিন্তু মোটেই রাজী নই। তারচেয়ে তুমি কি চাও বল। কি হলে আমাকে রেহাই দেবে, তাই বল।'

শ্যামাকান্ত বললেন, 'আপনাকে আমি খেলা দেখাব বলে এতদূর এসেছি। সে আশা যদি পূর্ণ না করেন, তাহলে আর একটি ইচ্ছা পূর্ণ করুন।'

'বেশ তোমার ইচ্ছাটি কি, বল?'

পকেট থেকে তাড়াতাড়ি একটা কাপড়ের থলি বের ক'রে শ্যামাকান্ত বললেন,—'এই থলেটি পূর্ণ করুন।'

—'কত টাকা দিলে থলেটি পূর্ণ হবে, শ্যামাকান্ত?'

—'হাজার দুই দিলে ভরে উঠবে।'

তখুনি সেই টাকা মঞ্জুর করলেন মহারাজ। টাকাটা দিয়ে যেন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন।

এরপর শ্যামাকান্ত বেশীদিন আর লোকালয়ে থাকেন নি। গার্হস্থ্য জীবন তাঁর ভাল লাগেনি। সবকিছু ছেড়ে সন্ন্যাসীর বেশে বাকী জীবন, বনে বনান্তরে ঘুরে বেড়িয়েছেন। কয়েক বছর পর নৈনিতালের কাছাকাছি ভাওয়ালী নামে এক জায়গায় একটা আশ্রম প্রতিষ্ঠা ক'রে শেষ জীবনটা সেখানেই কাটিয়ে দেন। সেই সময় সময় তিনি আর শ্যামাকান্ত নামে পরিচিত ছিলেন না। তাঁর নাম তখন সোহং স্বামী। ধর্ম বিষয়ে তাঁর লেখা একখানি বই আছে। বাংলা পয়ারে লেখা তাঁর এই বইটি অনেকের মতে একটি সমৃদ্ধ রচনা।

পুস্তক পরিচয়

বাঘ বন্দী মন্তর—লেখক—শিশির বিশ্বাস, প্রকাশক—নিউ স্ক্রিপ্ট। এ-১৪ কলেজ স্ট্রিট মার্কেট, কলিকাতা ৭০০০০৭। দাম দশ টাকা।

সুন্দর ছাপা, শক্ত, চকচকে রঙিন মলাট, ভেতরেও কয়েকটা ছবি আছে, তুলনায় দামটা কম। জংগলের কথা নিয়েই বেশির ভাগ লেখা, বাঘ বন্দী মন্তর নাম হলেও বাঘ, ভালুক, কুমীর সবাই আছে ঃ আর আছে মানুষ—গভীর জংগলে যারা হিংস্র জানোয়ারকে ভয় করেনা তারা। আবার সন্দেশের পাঠকদের মতো অল্প বয়সীরাও আছে। এদের প্রাকৃতিক জীবনের সংগে মিশেছে অলৌকিক কথা—'সায়েন্স ফিকশন' না 'টাইম মেশিন' না কি বলব? লেখকের কলমের জোরে সবগুলিই চিত্তাকর্ষক হয়েছে, পত্রিকার পাতায় পড়া থাকলেও আবার পড়তে ভালো লাগবে।

তেপান্তর পার হয়ে—পূর্বভারতীয় রূপকথা ঃ কথক দেবব্রত ঘোষ, প্রচ্ছদ ও রেখাচিত্র—রামানন্দ বন্দোপাধ্যায়, প্রকাশক—কবিতা ঘোষ. পরিবেশক—নয়া প্রকাশ, ২০৬ বিধান সরণি, কলকাতা-৭০০০০৬। দাম পনেরো টাকা।

"একটি উপন্যাস, একটি গল্প এবং একটি পুচ্ছাংশের কাহিনী নিয়ে চিরকালীন রূপকথার এই আসর"—এগুলি হলো 'তেপান্তর পার হয়ে 'অমরাবতীর কন্যে' আর 'ফুরিয়ে যাওয়ার কথা'! বইয়ের প্রথমেই শিক্ষক লেখক (নিশ্চয়ই প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত) মা বাবাদের জন্য লম্বা উপদেশ লিখে দিয়েছেন ঃ এখানে মতভেদের জায়গা থাকলেও গল্প ও ছবিগুলি উপভোগ্য, পুচ্ছাংশটিও রীতিমতো ছোট্ট একটি গল্প। সব কটিই রূপকথা।

শেষে একটা প্রশ্ন—'পূর্বভারতীয় রূপকথা' কোন রাজ্যের? দিদিমা-ঠাকুমা-ঠাকুর্দার ঝুলি ঝেড়ে এগুলিকে পাইনি, কাজেই জিজ্ঞাসাটা রেখে দিলাম।

শারদীয়া চমচম—শিলিগুড়ি থেকে প্রকাশিত ছোটদের দ্বিমাসিক পত্রিকা। সম্পাদিকা—রেবা মৈত্র। দাম—বারো টাকা।

বাজারে চলতি বইয়ের তুলনায় বারো টাকায় এত বড় বইটা খুবই শস্তা। পাতায় পাতায় ছবি, গল্প আর প্রবন্ধ। প্রায় সব ছবিই উৎরেছে, অধিকাংশ গল্পও ভালো। পুজোর ছুটির ভালোই খোরাক।

১। কিশোর নাট্যগুচ্ছ ঃ দীননাথ সেন, প্রকাশক—সম্পাদক বল্মীক প্রকাশন, ৫৭ এ গরচা রোড, কলিকাতা ৭০০০১৯। দাম আট টাকা।

পাত্‌লা চটি বই, ছোট অক্ষরের পরিষ্কার ছাপা। প্রচ্ছদ এঁকেছেন রেবন্ত গোস্বামী—। এতে কিশোরদের জন্য চারটি নাটিকা আছে, প্রত্যেকটি সুলিখিত ও অভিনয়োপযোগী। প্রথম নাটক 'একটি ভুলের জন্য' হাসিয়ে ছাড়ে, কিন্তু শেষে 'ক্লাইম্যাক্স' বা নাটকীয় সমাপ্তি হয়নি। দ্বিতীয় নাটক 'ব্যাকরণবিভ্রাটে' শেষে কবির লড়াইয়ের মধ্যে দিয়ে সাধু ও চলিত ভাষার সহাবস্থানের ব্যবস্থাটা উপভোগ্য।

শেষের নাটক ডাঃ সর্বাবিদ্যার 'মিউজিক সিরাম', 'আইনস্টাইন সিরাপ' 'আর্যভট্ট ক্যাপসুল' প্রভৃতি ওষুধের নাম চমক লাগালেও কাজি নজরুলের 'বিদ্রোহী' কবিতায় 'প্যাথেটিক' বা রবীন্দ্রনাথের 'বিপদে মোরে রক্ষা কর এ নহে মোর প্রার্থনা' গানে হাস্যরস খুঁজে পাওয়ার কথা অসম্ভব লাগে।

একশো পিদিম জ্বলে ঃ সম্পাদক পার্থজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়, পরিবেশক ময়না প্রকাশনী, ১৪ এ টেমার লেন, কলিকাতা-৯ প্রচ্ছদ সুব্রত চৌধুরী। দাম—আট টাকা।

সুকুমার রায়ের উদ্দেশ্যে রচিত ৫৮ টি ছড়ার সংকলন। ছড়াকারদের মধ্যে বাংলাসাহিত্যের মহারথী ও রথিনীদের মধ্যে কে-যে নেই তা বলা যায় না।

কল্যাণী কার্লেকর

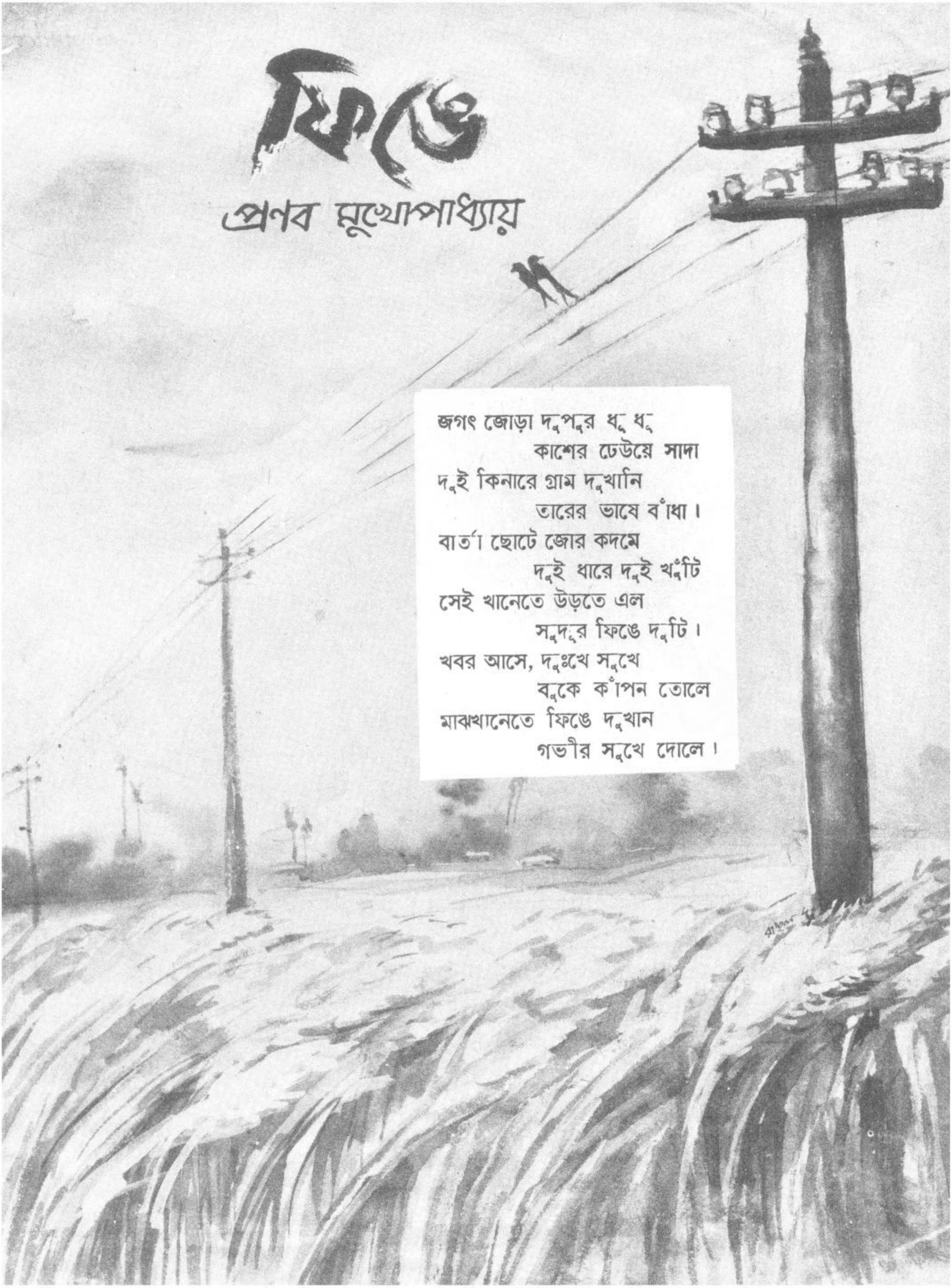

ফিঙে

প্রণব মুখোপাধ্যায়

জগৎ জোড়া দুপুর ধু ধু
কাশের ঢেউয়ে সাদা
দুই কিনারে গ্রাম দুখানি
তারের ভাষে বাঁধা।
বার্তা ছোটে জোর কদমে
দুই ধারে দুই খুঁটি
সেই খানেতে উড়তে এল
সুদূর ফিঙে দুটি।
খবর আসে, দুঃখে সুখে
বুকে কাঁপন তোলে
মাঝখানেতে ফিঙে দুখান
গভীর সুখে দোলে।

হিজিবিজবিজ
আহা ! বেশ খাসা আইসক্রীম
এই রে ! ভুতু আসছে। আইসক্রীম লুকোই। নৈলে ....
আরি বাপ, ন্যাড়া যে !! কতদিন পরে দেখা ! ও বাবা, আরো মোটা হয়েছিস
ন্যাটা
আহা হা - জামাটা একদম টাইট হ'য়ে গেছে। এবার ফেটে যাবে
কিরে, অমন মুখে কুলুপ এঁটে রয়েছিস কেন, ... তোর হাতটাইবা.. ....
হেঁ হেঁ এ-
পেছনে কিছু লুকোচ্ছিস বুঝি ?
ন-না তো
কই দেখি
ওমা! ওইটুকু একটা কাঠি সেইথেকে লুকোচ্ছিস ? ওটা কিসের কাঠি-রে ?
কাঠি ?!?
উঁঃ হো হো - হায় হায়
?

প্রকৃতি পড়ার দপ্তর

উত্তরের হাওয়ায়

জীবন সর্দার

পুবের জানালা দিয়ে ভোরের রোদ, বছরে দুই সময়ে, ডানদিক থেকে তেরচা ভাবে ঘরে ঢোকে। শীত শুরুর আগে একবার। শীতের শেষে ফের একবার, মাঝের সময়টুকুতে জানালায় আলো আসার 'কোণ' প্রতিদিন শুধু বদলায়। শীতের আগে কমতে থাকে, শীতের মাঝেই, মানে বড়দিনের সময় থেকেই সে আলোর কোণ বাড়তে থাকে।

যেহেতু পুবের জানালাটাই, আমার ঘরে, আলো আসার জানালা, তাই আলোর নড় চড়া আমি ভালো করে দেখতে পাই। তার সাথে আরো কিছু দেখি।

যেমন, মেঘের রং ফেরা। বর্ষায় মেঘের যে রং সে রং শরতে থাকে না। বর্ষায় হাওয়া যে দিক থেকে বয়, শরতের পর, হাওয়া সেদিক থেকে আর চলেনা। অতিকায় সাদা মেঘ তখন খুব আস্তে আকাশ পার হয়। হাওয়া বইতে থাকে উত্তর থেকে। সিরসির ঠাণ্ডা আমেজ পাই সে হাওয়ায়।

উত্তরের হাওয়ার ভালো মত পরিচয় পেলাম এবার কার্তিক মাসের সাত তারিখে। আকাশে বড়সড় মেঘ ছিল। বাতাস ঠাণ্ডা ছিল। দুপুরের রোদ চড়া হলেও বৃষ্টি ভেজা মাঠে, জল শুকিয়ে যায়নি। মাঠের ধারে উড়ে এলো দুটি খঞ্জন। জমা জলের ধার থেকে ছুটে ছুটে পোকা ধরে খেল। কতবার আমার চোখের আড়ালে চলে গেল। তারপরই মিহি সুরে ডেকে ডেকে ফিরে এলো মাঠে। উত্তরের হাওয়া বইতে শুরু করলেই, এমনি সময়ে, খঞ্জনের দেখা পাওয়া আমাকে নিরাশ করেনি।

মাত্র দুটি খঞ্জন কদিনেই ছোট্ট মাঠটির সব পোকা খেতে পারে কিনা জানি না। কিন্তু উত্তরের হাওয়া চালু হলেই মাঠের জল শুকিয়ে যায়। তারপর পোকারাও নিরুদ্দেশ হয়ে যায়। ধীরে ধীরে ব্যাংগুলো ডাকাডাকি বন্ধ ক'রে, উত্তরের হাওয়া থেকে গা বাঁচাতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। কোথায় যে ওরা, কোন কোণে লুকিয়ে থাকে খুঁজে পাওয়া মুশকিল।

ভোর বেলা যখন শিশির ভেজা ঘাস মাড়িয়ে মাঠ পেরোই, দেখি, পায়ে চলা পথ ধরে কেঁচো মাটি তুলে রেখেছে। রাতারাতি কাজ সেরেছে ওরা। আর হিমের রাতে শিশিরে ভিজে, বেশ কিছু কেঁচো প্রাণ হারিয়ে পড়ে আছে। আর বর্ষার জল পেয়ে, নানাজাতের ঝোপ তরতরিয়ে বেড়ে উঠেছিল। উত্তরের হাওয়ার ছোঁয়া পেয়ে কিনা জানি না, মুষড়ে গেছে সেগুলো। আমি জানি ওদের আয়ু শেষ।

সবুজ মাঠ খেত, উত্তরের হাওয়ার স্পর্শ পাবার সাথে সাথেই নয়, কিছুদিন পর, রং হারায়। যে ধানে খেত সবুজে সেজে ছিল তিনচার মাস, যেই উত্তরের হাওয়া দিল, জলে টান ধরল, সোনালী রং ধরল তাতে। ধান

পাকার মরশুম তখন। কিছু গাছের পাতা লাল হয়ে গেল, কিছু গাছের পাতা হলুদ হল। তারপর সেই উত্তরের হাওয়া লেগেই সেগুলো খসে পড়বে। কোন গাছের পাতা একমাসে ঝরবে, কোনটার বা একটি একটি করে। যতদিন উত্তরের হাওয়া বইবে, ততদিন আর সে গাছে পাতা দেখা দেবেনা। ফাল্গুনে যখন হাওয়ার দিক পালটাবে, তখন নতুন পাতায় ভরে উঠবে সেই পাতা ছাড়া গাছের ডাল।

ভেতরে ভেতরে তৈরী হবে অনেক গাছ। মানে যতদিন এই উত্তরের হাওয়া থাকবে, সে সময়ে সেই গাছে ফুল ফুটবে, ফুল থেকে গুটি হবে ফলের। ফল পাকবে হয়তো গরম কালে, কিন্তু গাছ তার জন্য তৈরী হবে উত্তরের হাওয়ার ছোঁয়া পেলেই। আম গাছকে লক্ষ্য করলেই বুঝবে—বোল থেকে ফল হতে কি কি হাওয়া কাজে লাগে।

সেদিক থেকে একবার যত্নে গড়া বাগানের দিকে নজর গেলে আর চোখ ফেরেনা। উত্তরের হাওয়া যত পেরেছে রং ফেলেছে সাজানো বাগানে। আসলে এই হাওয়াতেই মরশুমি ফুলের, বাহারে রংয়ের ফুলের চাষ হয়। যে জানে সে সময় বুঝে সাজিয়ে তোলে ফুলের বাগান। সবজিরও।

উত্তরের হাওয়ায় যখন হিমের আভাস ঘন হয়ে আসে। রাতের আকাশে তখন যাযাবর হাঁসের ডাক শুনতে পাই। উত্তর থেকে দক্ষিণে তাদের গতি। প্রতি বছর ঠিক সময়ে ঠিক দিকে। দিনের আলোয় নদীর চড়ায়, ঝিলের মাঝে তাদের খুঁজে খুঁজে দেখি। রং গড়ন দেখে তাদের চিনে রাখি। তারপর হাওয়ার দিক পালটালে, হাঁসেরা যখন দিক পালটায় ওড়ার, ঘরমুখো হয়, আমি তখন, তারার আলোয় ওদের উত্তর মুখো সারের দিকে তাকিয়ে মনে মনে বিদায় জানাই। আর বলি, হাওয়া ঘুরলে আবার এসো।

পাখিরা কোথায় ?

বছরের শুরু থেকেই, আমি খোঁজ করি, আমার চেনা পাখিগুলি, আমার চেনা জায়গায় হাজির আছে কিনা। এবার এখনো বাঁশপাতি, চাতক আর ফটকা—একটাও দেখিনি। এই শরতের মাঝামাঝি, তিন 'পড়ুয়ার' সাথে, একদিন গ্রামবাংলায় সফরে গিয়েছিলাম। ভেবেছিলাম অচেনা জায়গায়, হয়তো চেনা পাখিদের দেখা পাব। পথে যেতে যেতে নীলকণ্ঠ দেখেছি অনেক জায়গায়। ফিঙে দেখেছি। লাটোরা দেখেছি। কিন্তু ওই তিন ধরণের পাখি কোথাও দেখিনি।

গরমের দিনগুলোয় আশা করেছিলাম 'বাঁশপাতির' দেখা পাব। সেই পাখিটা, সবুজ রংয়ের। উড়তে উড়তেই মৌমাছি ধরে ফেলে সুঁচলো ঠোঁটে। লম্বা লেজের মাঝের পালক

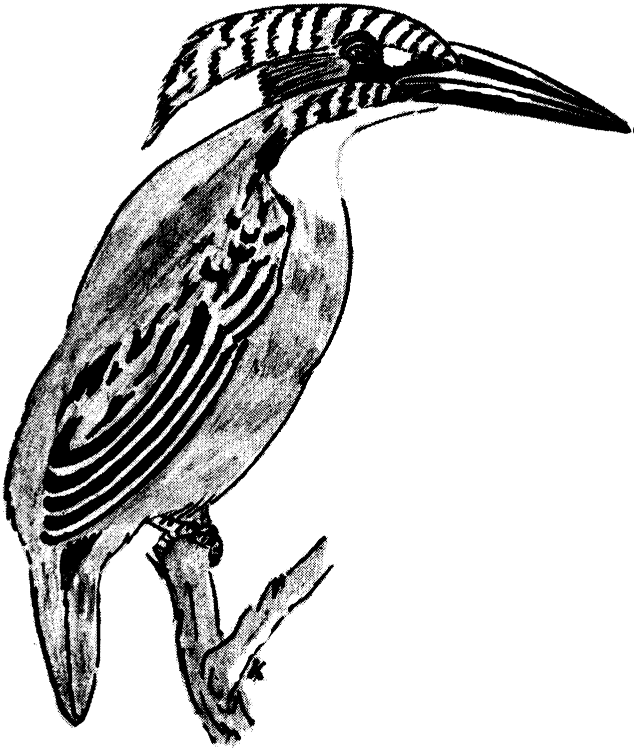

দুটি আরো লম্বা। সরু সরু। মাটিতে গর্ত খুঁড়ে বাসা বানায় গরম কালে। বাসার কাছেই উঁচু গাছে বসে থাকে। হঠাৎ মিষ্টি সুরে 'তিরি তিরি' ডাক দিয়ে ঝাঁপ দেয় পোকার পিছে। এবার অনেকদিন হলো দেখছি না ওদের।

এবার বৃষ্টি শুরু হয়েছে জ্যৈষ্ঠ থেকে। তখন থেকেই, চাতকের ডাক শুনব বলে কান পেতে আছি। শুনতে পাইনি আজও। গাছ থেকে গাছে, উড়ে যেতে যেতে, 'পিউ পিউ পিউ', ডাক শুনেই বুঝতে পারি কি পাখি। মাথায় ঝুঁটি, লম্বা, লেজ, সাদা কালো পাখিটিকে বর্ষাকালেই প্রতিবছর দেখতে পাই। তারপর, দিনের তাপ আর আলো কমে গিয়ে, অন্য ঋতু শুরু হতেই, তাকে দেখিনা। কিন্তু 'ফটকা' পাখিটিকে দেখি।

ফটকা, সাদাকালো পালকের মাছরাঙা। চাতকের মত পিঠ কালো বুক সাদা নয় তার। মাথায় গলায় গালে লেজে, কালো চওড়া ডোরা ফটকার। ছোরার মত ঠোঁট। জলার উপর, সোজা থেকে উড়তে উড়তে ঝপ্ করে ঝাঁপ দিয়ে মাছ ধরেই, ফের পছন্দ জায়গায় চুপচাপ বসে খাবার সারে। এক জায়গায় স্থির হয়ে ওড়া ফটকার মত আর কে পারে জানি না। এই বছর ফটকা এখনো দেখিনি। কোথায় গেল ওটি!

[হয়তো তোমাদের কেউ, পাখি তিনটির একটিকেও কোথাও না কোথাও দেখতে পাবে। সন্দেশের ঠিকানায় আমাকে চিঠি দিয়ে জানিয়ে দিও—কোথায়, কোন পাখিটিকে দেখলে। কি করছিল পাখিটি তখন, লিখো। জী, স,]

প্রকৃতি পড়ুয়ার পাঠশালা

প্রতিমাসের প্রথম রোববার সন্দেশ কার্যালয়ে বিকেল চারটে থেকে ছ'টা।

[শীতকালিন]।

সন্দেশ যে পড়ে, ছয় বছরের বেশী বয়স, যে কোন ছেলে মেয়ে প্রকৃতি পড়ুয়ার দপ্তরের সভ্য হতে পারে।

আর সব নিয়ম কানুন সন্দেশে কার্যালয় থেকে জেনে নাও নিজে এসে বা চিঠি লিখে।

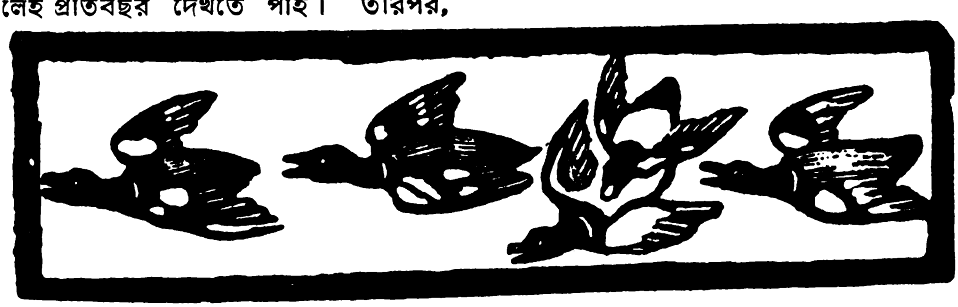

কালাচাঁদ বনাম পাগলা দাশু

কালাচাঁদ কতগুলো ছবি এঁকেছিল ; পাগলা দাশুর সেগুলো ভারি পছন্দ ! ঝটপট সেগুলো নকল করে নিল ও। একেবারে হুবহু নকল ! কিন্তু প্রোফেসর নিধিরাম পাটকেলকে দেখাতেই উনি বললেন, 'এ কিহে ! এক একটা ছবিতে অনেকগুলো করে ভুল !' দাশু দেখল ভাল করে, —তাইতো !

একটা ছবি আমরা ছাপলাম। বাঁদিকেরটা কালাচাঁদের আঁকা, ডান দিকেরটা দাশুর। বলতে পারো, ভুলগুলো কী কী ?

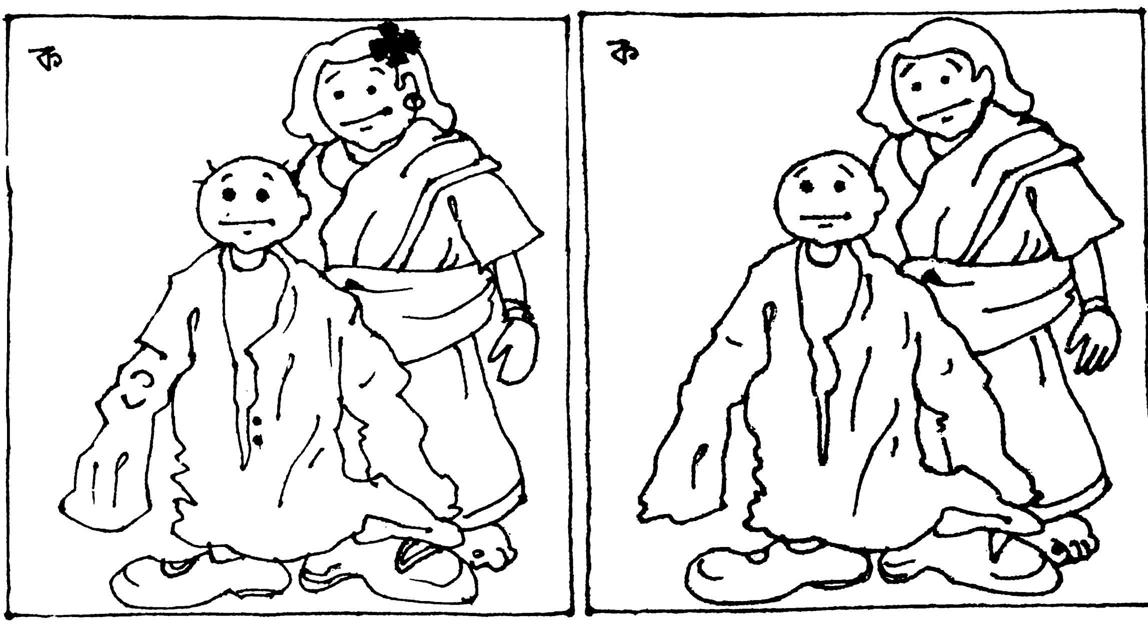

কালাচাঁদ বলল—'জাত ছেড়ে বেশী পয়'। প্রোফেসর উত্তর দিলেন—'তোমার বাজু জানা বাকি ?'

কে কি বলল বুঝতে পারলে কি ?

না বুঝলে ৯২২ পৃষ্ঠা দেখ

১। ৩৩৭৫ অনির্বাণ মিত্র, ১৫ বছর

সন্দেশকে সাপ্তাহিক অথবা পাক্ষিক করা সম্ভব হবে না। রঙিন করতে পারলে অবশ্যই ভাল হয়। কিন্তু আরো অনেক গ্রাহক না পেলে সেটাও করা যাচ্ছে না। তোমরা সবাই মিলে চেষ্টা করে আরো গ্রাহক সংগ্রহ কর না কেন ?

কোন কোন লেখা তোমাদের ভাল লাগছে, কার লেখা আর কেমন লেখা আরো চাও সেটা সর্বদা জানিও। আমরা জোগাড় করার চেষ্টা করব।

তোমার লেখা গল্পটা বেশ মজার। ছাপা হবে, তবে কোন মাসে সেটা ঠিক বলা যাচ্ছে না !

২। ২২৯৬ মৃন্ময়ী ও দেবাঞ্জন দে

প্রত্যেক চিঠিতে নিজেদের বয়স লিখো। সন্দেশের লেখাগুলি তোমাদের ভাল লাগলে আমরাও খুশি হই। কোন লেখা বেশি ভাল লেগেছে জানিও, সেরকম আরো জোগাড় করব। রঙিন ছবি দিতে পারলে আমাদেরও ভাল লাগত, কিন্তু তার আগে আরো অনেক গ্রাহক বাড়াতে হবে। জানোত, সন্দেশ কোনো বাণিজ্যিক সংস্থা নয় একটা সাহিত্যিক সমবায় সমিতিই—সুকুমার সাহিত্য সমবায় সমিতি—এর মালিক। অনেক লেখক, চিত্রকার ও বন্ধুর সহযোগিতায় কাজ চলে। তার মধ্যে তোমরা গ্রাহক গ্রাহিকারাও আছ।

৩। ৮৭৭ **কৌশিক ঘোষ** ১৬½

তোমাদের পত্রিকা 'নবভাস্কর' খুব সুন্দর হয়েছে। ছোটরা অনেকে খুব ভাল লিখেছে। তোমার আবেদন ছাপিয়ে দিলাম—

> ভাই গ্রাহক-গ্রাহিকা—আমি, কয়েকজন বন্ধুর সাহায্যে ছোটদের পত্রিকা 'নবভাস্কর' প্রকাশ করছি। বন্ধুরা যদি লেখা পাঠাও তাহলে খুশি হব। নাম, ঠিকানা, বয়স দিতে ভুলো না। ইতি—কৌশিক ঘোষ, নন্দন কানন, পোঃ ডানকুনি ৭১১২২৪, জেলা হুগলী।

৪। ৩৩৫১ দেবজ্যোতি মিত্র, ১৫

বুঝতেই পারছ, ভূতবাবাজীর কাণ্ড। এই ত তোমার সঠিক গ্রাহক নম্বর ছাপালাম। গ্রাহক-গ্রাহিকারা—তোমরা অগ্রহায়ণ মাসের সন্দেশে হাত পাকাবার আসরে **দেবজ্যোতির** গ্রাহক নম্বর ঠিক করে নাও।

৫। ২৩৪১ **কাজরী মুখার্জী, প্রায়** ১৬

সন্দেশের খাতায় তোমার গ্রাহক নম্বর ঠিকই আছে—চিঠি পত্রে ভূতের হাত পড়েছিল তাই এক হাজার নম্বর কমিয়ে দিয়েছিল ! এখন ঠিক নম্বর ছাপালাম।

খাম, পোস্ট কার্ড অথবা ইনল্যাণ্ড লেটারের ওপর পত্রবন্ধুর নাম আর গ্রাহক নম্বর দিয়ে সন্দেশের ঠিকানায় চিঠি লিখো—আমরা তাকে পাঠিয়ে দেব।

সমবয়সী পত্রবন্ধু/বান্ধবী চাই। শখ—বই পড়া, গল্প কবিতা লেখা, ক্রিকেট খেলা, পাহাড়ে চড়া, আর আড্ডা মারা।

৬। ২২৮২ **সুনন্দিতা দাশগুপ্ত (টুম্পা) ১২ বছর**

তোমার সুন্দর চিঠি পেয়ে খুশি হলাম। আরো কি কি মজা করলে জানিয়ো।

৭। ২৫৪৪ **শ্রীময়ী গাঙ্গুলী, ১৪ বছর**

তোমরা দক্ষিণ ভারতে গিয়ে ভাষা বিভ্রাটে পড়েছিলে তাই সন্দেশকে বলছ তামিল তেলুগু

শেখাতে !! এর পরে কেউ হয় তো কানাড়া, বা মিজো ভাষা শিখতে চাইবে! কিন্তু ভাষা শেখানো ত ছোটদের পত্রিকার কাজ নয়, পত্রিকার পক্ষে সেটা ভালভাবে করা সম্ভবও নয়। কলকাতায় অনেক দক্ষিণ ভারতীয় স্কুল আর আর সাংস্কৃতিক সংস্থা আছে, তাদের জিজ্ঞাসা করলে নিশ্চয় একটা ব্যবস্থা করে দিতে পারবে। চেষ্টা করে দেখতে পার।

৮। ৮৬৭ **দীপশিখা বিশ্বাস, বয়স ?**

যারা হাতে সন্দেশ নাও, গ্রাহক কার্ডও হাতেই পাবে। সন্দেশ নেবার সময়ে কার্ড নিয়ে যেও।

৯। ৭১৭ **মনসিজ গাঙ্গুলী, ৯ বছর**

তুমি পরীক্ষায় ভাল ফল করে নতুন ক্লাসে উঠেছ জেনে খুশি হলাম। তুমি পেনসিলে ছবি এঁকেছ কেন ? ওটাত ছাপা যাবে না। এর পরে কালো কালি বা রং দিয়ে ছবি এঁকে পাঠিও।

১০। ৪০২ **জ্যোতির্ময় দালাল, বয়স ?**

ইন্দ্রাণী দাশগুপ্ত স্মৃতি প্রতিযোগিতায় অনেক ভাল ভাল ছবি এসেছে। দুঃখের বিষয়, অনেকগুলির পেনসিল অথবা রং দিয়ে আঁকা, ভাল হলেও ছাপা যাবে না। হাত পাকাবার আসরে তাই কালো কালি বা রং আঁকা ছবি ছাড়া কিছু নেওয়া হয় না।

১১। ৭০২ **উন্মগ্ন পয়ড়া, ৮ বছর**

অনেক লেখা আসে, সব ত আর ছাপা যায় না। তুমিও আরো পাঠাও—যেটা সবচেয়ে ভাল হবে, ছাপাব।

১২। ৯১ **বাসবদত্তা ধর, বয়স ?**

তোমার সুন্দর চিঠি পেয়ে খুব খুশি হলাম। এবার তুমিও গ্রাহক হয়ে গেছ, খাতায় নাম লিখে নিয়েছি। তুমিও লেখা আর ছবি পাঠিও। তোমার বয়স ঠিক কত বলত ? একবার পাঁচ লিখেছ আবার লিখেছ ছয়! গার্গীর বয়স কত ?

১৩। ৩০৮৮ **মনোশ্রী রায়চৌধুরী, বয়স ?**

তোমরা এমন মজা করে বেড়ালে, সে বিষয় লিখেছ আবার ছবিও এঁকেছ। তাহলে সেগুলো পাঠাওনি কেন ?

১৪। ৭৭২ **সুতনুকা সেনগুপ্ত, বয়স ?**

তুমি স্টার ও দুটি লেটার সহ ৭৮% নম্বর পেয়ে মাধ্যমিক পরীক্ষা পাশ করেছ জেনে খুব খুশি হলাম। অভিনন্দন জেনো। আশা করি উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষাতেও খুব ভাল করবে।

১৫। ৭১৭ **মনসিজ ও মনোরম গাঙ্গুলী, ৭৫২ পৌলমী ও শ্রীদীপ ঘোষ ৯৮৩ ইন্দ্রাণী, ঈশানী ও জ্যোতির্ময় মজুমদার,** ১১৬৮ **অনিন্দিতা ও মুনমুন দাশগুপ্ত, ২৫৭৮** বিনীতা **মুখোপাধ্যায়** ৩৩৫১ **দেবজ্যোতি** মিত্র **২১৫৩ কবিতা মুখোপাধ্যায়।**

তোমরা সন্দেশকে আর সন্দেশীদের ইংরেজি নতুন বছরে শুভকামনা জানিয়েছ, অনেকে সুন্দর সুন্দর কার্ড পাঠিয়েছ, খুব খুশি হয়েছি, সব কার্ড কার্যালয়ে সাজিয়ে রেখেছি। তোমরা আমাদের শুভকামনা জেনো।

- **যারা অন্তত: তিনটি গ্রাহক করবে তারা প্রত্যেকে পুরস্কার পাবে।**
- **প্রতিটি বার্ষিক (বৈশাখ চৈত্র ১৩৯৬) গ্রাহকের জন্য ২·০০ পুরস্কার পাবে।**
- **দশটি বার্ষিক গ্রাহক করলে আরো বাড়তি পাঁচ টাকা পুরস্কার পাবে।**
- **নতুন গ্রাহক করতে হবে, যারা ১৩৯৫তে গ্রাহক আছে তাদের চাঁদা এই হিসাবে ধরা হবে না।**
- **দশের উপর সব চেয়ে বেশী সংখ্যায় গ্রাহক যে করবে, সে পাবে আরও একটি বিশেষ পুরস্কার।**

ধাঁধা

কার্তিক মাসের ধাঁধার উত্তর

(১)

মাটির কলসী।

বুঝতে পারনি? খুব কঠিন লেগেছে? না-না এখানে গেছো-মেছো-মামদো জাতীয় কোন ভূতের কথা বলা হয় নি! পঞ্চভূতের নাম জানো না? ক্ষিতি (মাটি) অপ (জল) তেজ, মরুৎ আর ব্যোম। এখানে প্রথম দুই ভূতের কথা বলা হয়েছে। এ-কথা মনে রেখে আবার পদ্যটি পড়, মাটির কলসী তৈরি করা থেকে তাতে জল ভরা পর্যন্ত ঘটনার বিবরণ পাবে।

এই ধাঁধা প্রায় পঁচাত্তর বছর আগে সন্দেশে বেরিয়েছিল, হয়তো তোমাদের কারো কারো দাদু-দিদারা উত্তর দিয়েছিলেন।

(২)

ডিম - হাঁস, মুরগি বা যে কোনো সাদা ডিম।

(৩)

উপেন্দ্রকিশোর, সুকুমার, সত্যজিৎ।

(৪)

মশক, চাটাই, সিধা।

সঠিক উত্তর দাতাদের নাম

চারটে উত্তরই ঠিক

২৩৭৯ অর্পিতা ও কিংশুক সিংহ, ৩৩৫১ দেবজ্যোতি মিত্র,

তিনটে ঠিক আর একটা প্রায় ঠিক

২৭৬৭ শঙ্খ সান্যাল

তিনটে উত্তর ঠিক

২৮৩১ অভিষিক্তা আচার্য, ৩০০৩ শুভব্রত সেনগুপ্ত

দুটো ঠিক, একটা প্রায় ঠিক

১৮০ আত্রেয়ী সাহা, ২৪৬ কৃষ্ণ অনন্যা, কৃষ্ণ অর্চনা, কৃষ্ণ অন্তনা দেব। ২৭২২ শম্পা ও দেবযানী চট্টরাজ ৩১৫৭ নওশাদ ও আসাদ জামিল

একটা ঠিক আর দুটো প্রায় ঠিক

২৩৪৮ দেবশ্রী মণ্ডল

শ্রাবণ মাসের ধাঁধার দেরিতে পাওয়া উত্তর

দুটো ঠিক আর একটা প্রায় ঠিক

৬৪৪ রত্না রায়

ক-এর কাণ্ড প্রতিযোগিতার ফলাফল

ক বিভাগ—প্রথম পুরস্কার—৫০.০০ —১১৭৫ দেবদ্যুতি দাস

দ্বিতীয় পুরস্কার — ২৫,০০ — ২১৪৬ অঙ্গনা দাস

তৃতীয় পুরস্কার—১৫.০০—স্বরূপ কান্তি গুপ্ত (গ্রাহক নয়)

খ-বিভাগ—প্রথম পুরস্কার—৫০.০০ ১১৭৫ ক্যামেলিয়া দাস

দ্বিতীয় পুরস্কার—২৫.০০—১৩৩—সুদেষ্ণা গাঙ্গুলী

তৃতীয় পুরস্কার—১৫.০০—কৌশিক মজুমদার (গ্রাহক নয়)

এদের উত্তরও খুব ভাল হয়েছিল—**ক-বিভাগ**

১৫০ সৌমিক মুখোপাধ্যায় ১১১৮ অন্বেষা দত্ত ১৬২৭ অপর্ণা ঘটক, ২০৭৯ কিংশুক মিত্র, ২১০০ বৈশাখী মণ্ডল, ৩২০৭ ঈশা মুখার্জি ২০৭৯ কিংশুক মিত্র, ২১০০ বৈশাখী মণ্ডল, ৩২০৭ ঈশা মুখার্জি

গ্রাহক নয়—সুরঞ্জনা ব্যানার্জী, সুকন্যা ঘোষ, ইন্দ্রনাথ মুখার্জী, সোমা ধাড়া, রঞ্জা বন্দ্যোপাধ্যায়, সৌমিক মুখোপাধ্যায়।

খ-বিভাগ—২৭১ দিব্যজ্যোতি বিশ্বাস ২৭৪ ঈশিতা বসু, ৫৯৫ সুগত বসু, ৬২৫ শিপ্রা রায় চৌধুরী ৬৭৯ শুভশ্রী রায়, মনীষা দাশ, ১৫৪২ অপরাজিতা চক্রবর্ত্তী ১৭৭৯ রেশমী দত্ত, ২২৮২ সুনন্দিতা দাশগুপ্ত ! ২৫০২ অপরাজিতা ধাড়া, ৩৩৫১ দেবজ্যোতি মিশ্র, নিভা সরকার (গ্রোহক নয়) আরো অনেকের উত্তর বেশ ভাল হয়েছে তাদের সংখ্যা এত বেশি যে নাম ছাপা গেলনা।

কি কান্ড, কি কাণ্ড !! বাপরে কি কান্ড !!!

ক-এর কাণ্ড দেখলাম আর দেখলাম গ্রাহক পাঠকদের কাণ্ড ! ইংরেজি বাংলা বড় বড় অভিধান ঘেঁটে যে সব নামের তালিকা বানিয়েছ, দেখতে আমাদেরও অভিধান ঘাঁটিতে হল ! কারো কারো তালিকা একশ ছাড়িয়ে গিয়েছিল—কিন্তু না, আমরা **কিছু কিছু** কেটেছি। তবু অবশ্য দুজন ৮০-র চেয়ে বেশি, চারজন ৭৫ এর বেশি। আর অ-নে-কের ৬৫/৭০-র বেশি নামের তালিকা বেরোল কেটে কুটে ও কি কি কাটা গেছে শোন—**কল্পিত সম্পর্ক বা নাম**—কাকা-কাকী কর্মচারী, কমল ইত্যাদি, **কল্পিত, যা দেখা যাচ্ছে না**—যেমন কনকচূড় (ধান) কাস্তে, কন্দ, **বিশেষন বা ক্রিয়া**—কচি (খোকা) কোঁচানো (ধুতি)।

তোমরা সবাই অভিনন্দন জেনো।

শিয়াল

বিশ্বপ্রিয়

বনেরও না ঘরেরও না,
গাঁয়ের ধারে থাকে।
সাঁঝ আঁধারে হঠাৎ কেমন
হুক্কা-হুয়া ডাকে !
শঠের রাজা শেয়াল ও যে,
সুলুক জানে নানা-
তাই খেয়ে যায় খোঁয়াড় ভেঙে
হাঁস-মুরগির ছানা !
কেউ জানে না দেয় যে হানা-
কখন কোন ফাঁকে,
তাই সকলে এড়িয়ে চলে
ধূর্ত শেয়ালটাকে ॥

ক্যালগারিতে ১৯৮৮র শীত-অলিম্পিক

ঋষিন হালদার

১৯৮৮র, ১০ই ফেব্রুয়ারী থেকে ২৮শে ফেব্রুয়ারী পঞ্চদশ শীত-অলিম্পিক-এর আসর কানাডার দক্ষিণ-পশ্চিমে অ্যালবার্টা রাজ্যের ক্যালগারি শহরে অনুষ্ঠিত হল। শীত-অলিম্পিক-এর খেলাগুলো সব বরফের উপর হয়। এইখানে চারদিকে বরফের কোন অভাব নেই, বিশেষ করে শীতকালে, তাই এই জায়গাটি শীত-অলিম্পিক-এর আসরের জন্যে উপযুক্ত। এখানে বিভিন্ন দেশের খেলোয়াড়দের সাফল্য ও হতাশা আমি দেখার সুযোগ পেলাম।

১৩ই ফেব্রুয়ারীতে 'ম্যাকমাহন' স্টেডিয়ামে উদ্বোধনী অনুষ্ঠান খুব জাঁকজমকপূর্ণ এবং ঝলমলে হয়েছিল। ৫৭টি দেশ এই অলিম্পিকে অংশগ্রহণ করেছিল। আমি খুব খুশী হলাম যখন অলিম্পিক-মিছিলে ভারতের পতাকা উড়িয়ে চারজনের একটা দল মার্চ পাস্ট করে গেল। ভারতের মত আরও কয়েকটি দেশ যেখানে বরফের উপর খেলা জনপ্রিয় নয়, যেমন-সাইপ্রাস, মরক্কো, গুয়াম, লুক্সেমবার্গ, ফিজি ইত্যাদি তাদের তিন চারজনের ছোট দল দিয়ে মার্চ পাস্ট করল। বিভিন্ন দেশের মিছিল শেষ হয়ে যাবার পর শুরু হল সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। কানাডার নিজস্ব লোকনৃত্যগুলি দেখে মুগ্ধ হবার মত। এর পরে কানাডার গভর্নার জেনারেল শ্রীমতী জিয়ান সভ্ ১৫শ শীত-অলিম্পিক উদ্বোধন করলেন। অলিম্পিকের পতাকা উদ্বোধন করা হল, খানিক পরে রবিন পেরি নামে ১২ বছর বয়সের একটি মেয়ে বিশাল অলিম্পিক মশাল জ্বালাল। ৯টি উড়োজাহাজ আকাশে উড়ে বিভিন্ন রকমের রঙের গ্যাস আকাশে ছেড়ে আকাশ রঙীন করে তুলল। অলিম্পিক শুরু হল এই আনন্দোৎসব দিয়ে।

প্রথম দিনে 'স্যাডল্‌ডোম' স্টেডিয়ামে "বরফ হকি (Ice Hockey)" তে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে অস্ট্রিয়ার খেলা হল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বরফের উপর ভাল খেলে অস্ট্রিয়াকে ১০-৬ গোলে হারাল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত পরের দিনগুলিতে রাশিয়াই সবচেয়ে ভাল খেলেছিল। তারা মাত্র একবার ফিনল্যাণ্ডের কাছে হারা ছাড়া বাকি সব দলকে ভালভাবে পরাজিত করে সোনার পদকটি লাভ করেছিল। ফিনল্যাণ্ড রুপোর পদকটি পেল, সুইডেন নিল ব্রোঞ্জ পদকটি।

বরফ হকি ছাড়া অ্যালপাইন-স্কি, ক্রস-কান্ট্রি স্কি, বাইঅ্যাথ্‌লন ,বব্‌স্লেড্ (স্লেজ্), লুজ্,

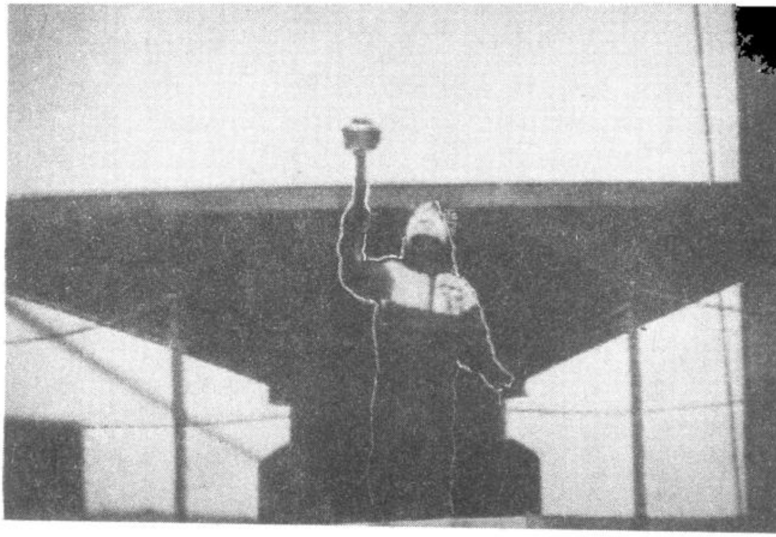

স্কি জাম্পিং, ফ্রি স্টাইল স্কি, স্পিড স্কেটিং এবং ফিগার স্কেটিং ইত্যাদি শীতের খেলার মধ্যে পড়ে। পরের দিনগুলি থেকে এই খেলাগুলি অনুষ্ঠিত হতে শুরু করল।

"অ্যালপাইন-স্কি (Alpine Skiing)" পাঁচ রকম প্রতিযোগিতায় বিভক্ত। নাকিস্কা পর্বতে অ্যালপাইন-স্কি অনুষ্ঠিত হয়েছিল। সাধারণত অ্যালপাইন-স্কি-এর প্রতিযোগিতা-গুলিতে এক একবারে একজন করে খেলোয়াড় স্কি করে। যে অন্যদের চেয়ে সবচেয়ে কম সময়ে শেষে পৌঁছতে পারবে, সেই প্রথম হবে। ডাউনহিল স্কি প্রতিযোগিতা যেদিন শুরু হবার কথা ছিল সেদিন হয় নি, কারণ সেদিন প্রচণ্ড জোরে বরফের ঝড় বইছিল, সেইজন্যে পরের দিন থেকে ডাউনহিল প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছিল। ছেলেদের ডাইনহিল-এ সুইজার-ল্যাণ্ডের পারমিন জুরব্রিগেন সোনা জিতল। জুরব্রিগেন ১ মিনিট ৫৯·৬৩ সেকেণ্ডে নির্দিষ্ট দূরত্ব স্কি করল। একসময় ওর গতি ছিল ঘণ্টায় ১৩৩·৩ কিলোমিটার। আশা করা হয়েছিল যে জুরব্রিগেন সবকটি প্রতিযোগিতায় সোনা জিতবে, সে আশা পুরোপুরি সফল হয়নি। ওকে একটি সোনা এবং একটি ব্রোঞ্জ পেয়ে সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছে। ব্যক্তিগত দক্ষতায় ওর চেয়ে ভাল স্কি করে ইটালির অ্যালবার্টো টমবা ও সুইজারল্যাণ্ডের ভ্রেনি স্নাইডার এই বিভাগে দুটি করে সোনা পেয়েছে। অ্যালপাইন-স্কি-এর সবগুলি খেলা সুইজারল্যাণ্ডের খেলোয়াড়রাই বিশ্বশ্রেষ্ঠ। পুরুষ এবং মহিলা মিলিয়ে তারা মোট ১১টি পদক পেয়েছে।

"ক্রস-কান্ট্রি স্কি (Cross Counttry Skiing)" হল শীত-অলিম্পিক-এর একটি প্রধান খেলা। এই খেলাটি অনেকটা ম্যারাথন রেসের মত, কারণ স্কি খেলোয়াড়দের বরফ জমা সমতলের উপর দিয়ে দীর্ঘ দূরত্ব স্কি করতে হয়। এখানে অনেক প্রতিযোগী একসঙ্গে অংশগ্রহণ করে। সুইডেনের গুণ্ডে স্ভান অসম্ভব দক্ষতার সঙ্গে ৫০ কিলোমিটার স্কি করে সোনা জিতেছে আর দলগত প্রতিযোগিতায় আরেকটি সোনা পেয়ে মোট দুটো সোনা পেয়েছে। গত অলিম্পিক-এ ও দুটো সোনা এবং আরও দুটো পদক পেয়েছিল। অলিম্পিকে মোট ৬টি পদক পাওয়া প্রমাণ করে যে ও সত্যিকারের একটি ভাল ক্রস-কান্ট্রি খেলোয়াড়। কিন্তু এই প্রতি-যোগিতায় রাশিয়ার খেলোয়াড়রাই সামগ্রিকভাবে সবচেয়ে বেশী দক্ষতার প্রমাণ দিয়েছে। তারা ১৩টি পদক পেয়ে অন্যান্য ইউরোপের দেশ-গুলির তুলনায় বেশী পদক লাভ করেছে।

"বাইঅ্যাথলন (Biathlon)" হল আরেকটি আকর্ষণীয় খেলা। এই খেলাটি খেলতে হলে মোটামুটি সমতল বরফের উপরে স্কি করতে হয় এবং একটা নির্দিষ্ট দূরত্ব স্কি করে তারপরে একটা নির্দিষ্ট স্থানে থেমে ৫টি করে নিশানা বন্দুক দিয়ে গুলি বিদ্ধ করতে হয়। এইরকমভাবে খেলোয়াড়রা কয়েকটা নির্দিষ্ট স্থানে থেমে নিশানাগুলি গুলিবিদ্ধ করে।

যে সবচেয়ে কম সময়ে গন্তব্যস্থলে পৌঁছাতে পারবে, সে জিতবে। প্রতি নিশানা-লক্ষ্যভ্রষ্টের জন্যে প্রতিযোগীর ১ মিনিট বেড়ে যায়। ১০ ও ২০ কিলোমিটার রেসে, পূর্ব জার্মানীর ফ্যাঙ্ক-পিটার-রোএহ্‌ দুটো সোনাই জিতল, যদিও সে সবগুলি নিশানায় গুলি বিদ্ধ করতে পারে নি। রাশিয়ার ভ্যালেরি মেডভেৎসেভ দুটোতেই দুটি রুপোর পদক পেল। বাইঅ্যাথ্‌লনেই ৩০ কিলোমিটার রিলে প্রতিযোগিতায়, রাশিয়ার দলটি প্রথম হল। পশ্চিম জার্মানীয় দল দ্বিতীয় হল। ইটালির দল পেল তৃতীয় স্থান।

"বব্‌স্লেড্‌ (স্লেজ্‌) (Bobsled)" হল খুব বিপজ্জনক এবং প্রচণ্ড গতির খেলা। দুজন অথবা চারজন আরোহী স্লেজ গাড়ীতে বসে। এস্‌কিমোদের স্লেজের মত এই স্লেজ টানার জন্যে কোন কুকুর নেই। শুরুতে খেলোয়াড়রা স্লেজটিকে বরফের উপর দৌড়োতে দৌড়োতে ঠেলে, তারপরে যখন স্লেজটি গতি পায়, তখন ওরা স্লেজে বসে পড়ে, বরফের ঢালু পথে আরোহীসহ স্লেজটি প্রচণ্ড গতিতে এগোতে থাকে। বরফের পথটিতে অনেক ঘোরালো বাঁক আছে, আর পথটি খুব পিছল। প্রত্যেকবারে একটি করে স্লেজ অংশগ্রহণ করে, সময়ের তারতম্য অনুযায়ী প্রথম, দ্বিতীয় স্থান নির্দিষ্ট করা হয়। এই প্রতিযোগিতায় স্লেজ গাড়ীটি বাঁক নেওয়ার সময় খেলোয়াড়দের খুব সাবধানী হতে হয়, না হলে স্লেজ উল্টে যাবার সম্ভাবনা থাকে। দুই আরোহীর দলের প্রতিযোগিতায়, রাশিয়া প্রথম হয়েছিল, পূর্ব জার্মানীর দুটো স্লেজ দ্বিতীয় ও তৃতীয় হল। চার আরোহীর দলের প্রতিযোগিতায়, সুইজারল্যাণ্ডের দল সোনা জিতল, পূর্ব জার্মানীর দল রুপো পেল, রাশিয়ার দল ব্রোঞ্জ নিল। এই প্রতিযোগিতায় বেশ কয়েকটি দেশের বব্‌স্লেড্‌ বিপজ্জনকভাবে উল্টে গিয়েছিল।

এই ধরনের আরেকটি প্রতিযোগিতা হল "লুজ্‌ (Luge)"। এখানে স্লেজ গাড়ী নেই, পরিবর্তে একটি চ্যাপ্টা আকৃতির পাটাতন, যার তলার ব্লেডটির জন্যে এটি বরফের উপর ঘষে ঘষে এগোতে পারে। এই চ্যাপ্টা স্লেজটির উপর প্রতিযোগী খেলোয়াড় টান টান ভাবে চিত হয়ে শুয়ে থাকে। মাথায় হেলমেট, মুখ ফাইবার গ্লাস দিয়ে ঢাকা। বব্‌স্লেড প্রতিযোগীদেরও এই পোশাক পরতে হয়। বব্‌স্লেডের মত এখানেও এক একবারে একটি করে লুজ অংশগ্রহণ করে। এখানে খেলোয়াড় শুয়ে থাকার জন্যে বব্‌স্লেডের মত ঠেলতে পারে না, তাই শুরু হবার জায়গাটি বেশ ঢালু আর প্রতিযোগীরা শক্ত ধারাল নখওয়ালা গ্লাভ্‌স পরে। ঢালু জায়গা থেকে নামার সময় এই গ্লাভ্‌স বরফে লাগিয়ে লাগিয়ে আরও তাড়াতাড়ি এগোয়, তারপরে বব্‌স্লেডের মতই অভিকর্ষের জন্যে বরফে ঘষতে ঘষতে প্রচণ্ড গতিতে এগোয়। এই বিভাগে পূর্ব জার্মানীই ৬টি পদক পেয়ে নিজেদের দক্ষতা প্রমাণ করল। বাকি তিনটি পদক পশ্চিম জার্মানী (২) ও রাশিয়া (১) ভাগাভাগি করে নিল।

শীত-অলিম্পিক-এর আরেকটি প্রধান খেলা হল "স্কি জাম্পিং (Ski Jumping)"। স্কি-জাম্পাররা ৭০ অথবা ৯০ মিটার বফের খাড়াই পথে স্কি করে নেমে তারপরে শরীরের ভারসাম্য ঠিক রেখে যত দূরে লাফাতে পারে, লাফায়। এই সময় মনে হয় যেন খেলোয়াড়টি আকাশে উড়ছে। ব্যক্তিগত প্রতিযোগিতা হয়, দলগত প্রতিযোগিতাও হয়। ফিনল্যাণ্ডের ম্যাটি নাইকানেন ৭০ এবং ৯০ মিটারে দুটোতেই অপূর্ব দক্ষতা দেখিয়ে দুটো সোনা জিতল। নরওয়ে ও যুগোস্লাভিয়াও এই বিভাগে দুটি করে পদক পেয়েছে। দলগত প্রতিযোগিতায় ফিনল্যাণ্ড সোনা জিতল, যুগোস্লাভিয়া রুপো ও নরওয়ে ব্রোঞ্জ পদক পেয়েছে।

"ফ্রি স্টাইল স্কি (Free Style Skiing)" হল আরেকটি অবাক হয়ে দেখার খেলা। ফ্রি স্টাইল স্কি-এর এরিয়াল প্রতিযোগিতায়, প্রতিবারে একটি করে খেলোয়াড় প্রচণ্ড গতিতে স্কি করে একটি বরফের টিলার শীর্ষে পৌঁছায়।

এই গতির জন্যে খেলোয়াড়টি শীর্ষ থেকে বেশ খানিকটা উঁচুতে শূন্যে উঠে যায়। তারপরে অভিকর্ষের জন্যে নীচে নামতে শুরু করে। নামার সময় শূণ্যে শরীরকে বিভিন্নরকমভাবে ডাইনে বাঁয়ে এবং উপর নীচে ভল্ট করায়। কেউ কেউ অপূর্ব দক্ষতার সঙ্গে শূন্যেই বেশ কয়েকবার ৩৬০° কোণে শরীরকে ঘোরাতে পারে। এরপর ঠিকমত শরীরের ভারসাম্য বজায় রেখে বরফের উপর নামে। শূন্যে খেলোয়াড়দের এই অপূর্ব কলাকৌশল দেখে বিস্মিত হতে হয়। কানাডার খেলোয়াড় জেন-মার্ক-রোজন এই প্রতিযোগিতায় অপূর্ব দক্ষতা

ডিম্বাকৃতি। প্রতিযোগীরা যে জুতো পরে স্কেট করে, তার তলায় একটি মসৃণ ব্লেড থাকে। স্কেটিং ট্র্যাকে এক একবারে দুজন করে প্রতি-যোগী অংশগ্রহণ করে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ছেলেদের দলে ড্যান জ্যানসেন স্পীড স্কেটিং-এ সোনা পাবে আশা করা হয়েছিল, কিন্তু ওর প্রথম প্রতিযোগিতার দিনের সকালে ওর বোন লিউকোমিয়ায় মারা যায়। তাতে ওর মন ভেঙে যায়, সেইজন্যে প্রাথমিক প্রতিযোগিতার মাঝ পথেই ও বরফের উপর পড়ে যায়। বোনের মৃত্যুর জন্যে মানসিক আঘাত ও কাটিয়ে উঠতে পারে নি, তাই পরের প্রতিযোগিতাতেও

দেখিয়ে সোনার পদক লাভ করেছে। এই প্রতিযোগিতায় অনেক প্রতিযোগী বরফে নামার সময় ঠিকমত ভারসাম্য বজায় না রাখতে পারার জন্যে বরফের উপর পড়ে গেছে। এ থেকে বোঝা যায় যে এটি কত শক্ত খেলা।

আরেকটি আকর্ষণীয় গতির খেলা হল "স্পীড স্কেটিং (Speed Skating)"। 'অলিম্পিক-ওভাল' স্টেডিয়ামে এটি অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এই স্টেডিয়ামে স্কেটিং করার জায়গাটি এত বড় যে দুটো ফুটবল স্টেডিয়াম আর একটা বাসকেটবল স্টেডিয়াম এখানে ঢুকে যাবে। বরফের উপর স্কেটিং রিঙকটি (Rink)

একইভাবে মাঝ পথে পড়ে গিয়েছিল। দুটি খেলাতেই ওর স্কেটিং-গতি যথেষ্ট দ্রুত ছিল, শেষ করতে পারলে হয়তো সোনাই পেত। ড্যান কোন পদক পায়নি বটে, কিন্তু অলিম্পিকের সকলে ওর দুঃখ ও বেদনার সমব্যাথী হয়েছিল। ড্যানকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের "অলিম্পিক-স্পিরিট" পুরস্কার দেওয়া হয়েছে। স্পীড স্কেটিং-এ মেয়েদের বিভাগে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বনি ব্লেয়ার চমকপ্রদভাবে ৫০০ মিটারে সোনা জিতে এবং ছেলেদের বিভাগে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এরিক ফ্লেম ১৫০০ মিটারে রুপো পেয়ে মার্কিনিদের হতাশার কিছুটা লাঘব

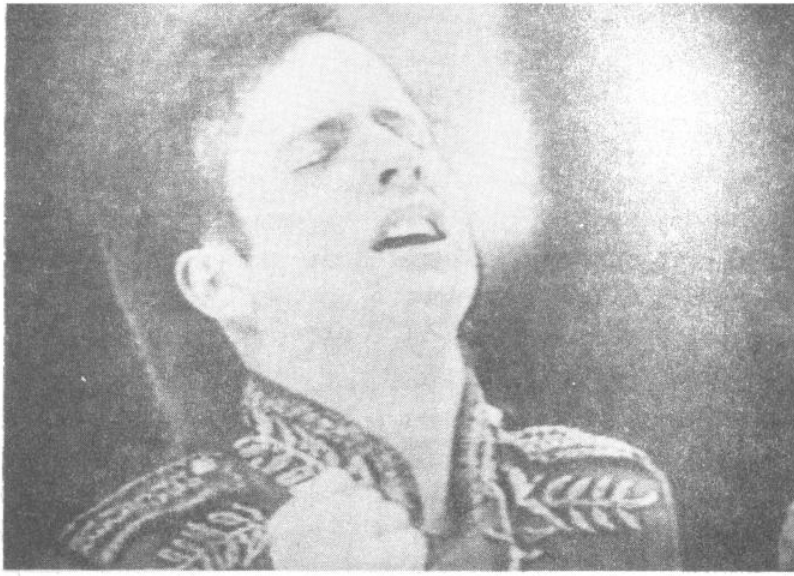

করেছে। এছাড়াও বনি ব্লেয়ার ১০০০ মিটারে একটি ব্রোঞ্জ পেয়েছে। নেদারল্যাণ্ড এই বিভাগে সবচেয়ে বেশী সোনা পেয়ে তাদের দক্ষতার স্বাক্ষর রেখেছে। মেয়েদের বিভাগে, নেদারল্যাণ্ডের ইভনে ভ্যান গেনিপ ১৫০০ মিটারে, ৩০০০ মিটারে এবং মিটারে প্রত্যেকটিতে সোনা পেয়ে দর্শকদের অবাক করে দিয়েছে। সুইডেনও ভাল স্কেটিং করে ২টি সোনার পদক লাভ করেছে। ছেলেদের বিভাগে, সুইডেনের টমাস গাসট্যাফসন ৫০০০ এবং ১০০০০ মিটারে দুটোতেই সোনা জিতেছে। অবশ্য সামগ্রিকভাবে এই বিভাগে পূর্ব জার্মানীর খেলোয়াড়দের দক্ষতা অনেক বেশী। তারা এই বিভাগে মোট ১৩টি পদক পেয়েছে।

এই অলিম্পিকে "ফিগার স্কেটিং (Figure Skating)" খেলাটি দেখে আমি সবচেয়ে বেশী আনন্দ পেয়েছি। এটি 'স্যাডল্ডোম' স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এই খেলাটিতে ব্যালে নৃত্যের অনেক প্রাধান্য আছে। একে বরফের উপর ব্যালেনৃত্য বলা যায়। প্রতিযোগীরা মাঝে মাঝে লাফিয়ে শূন্যে তিনবার ঘুরে তারপরে এক আশ্চর্য্য দক্ষতায় শরীরের ভারসাম্য বজায় রেখে বরফের উপর নাচতে পারে। এছাড়াও তারা আরও অনেক ব্যালেনৃত্যের সৌন্দর্য্য ও কলাকৌশল দেখায়। ছেলেদের একক প্রতিযোগিতায় বিচারকদের মাপকাঠিতে (০·১ পয়েন্টের জন্যে) ব্রায়েন বয়টানো কানাডার ব্রায়েন অরসারকে হারিয়ে সোনা জিতল। কিন্তু সাধারণ দর্শকের চোখে দুজনের তফাত করা খুব কঠিন। দুজনের খেলায় কোন খুঁত ছিল না। এই নিখুঁত শো দেখে অন্য দর্শকদের মত আমিও খুব খুশি হয়েছি। মেয়েদের অনুষ্ঠানও অত্যন্ত প্রতিযোগিতামূলক হয়েছিল। ১৯৮৬-এর ওয়ার্ল্ড-চ্যাম্পিয়নশিপ-এ কালো মেয়ে ডেবি টমাস সোনা পাবার পরে মার্কিনিরা ওর উপরে অত্যন্ত আশাবাদী হয়ে পড়েছিল। শেষ পর্যন্ত গত অলিম্পিকে সোনাজয়ী ক্যাথারিনা উইটের দীর্ঘ অভিজ্ঞতা ও নিখুঁত পারদর্শিতার কাছে ডেবিকে পরাজয় স্বীকার করতে হল। এলিজাবেথ ম্যান্লি রুপোর পদক নিল। ডেবিকে শেষ পর্যন্ত ব্রোঞ্জ পেয়ে সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছে। যুগ্ম প্রতিযোগিতায়, রাশিয়াই ছিল সর্বশ্রেষ্ঠ এবং ফেভারিট। ইয়াকেতারিনা গোরডিএভা আর সেরগেই গ্রিনকভ বরফের উপর ব্যালে নৃত্যের এক অপূর্ব কলাকৌশল দেখাল। তাই বিচারকদের এবং দর্শকদের বিচারেও তারা সোনা জিতল। "আইস ড্যান্সিং (Ice Dancing)" হল অনেকটা যুগ্ম ফিগার স্কেটিং-এর মত, কিন্তু আইস ড্যান্সিং-এ দুজনের কাউকেই ফিগার স্কেটিং-এর মত শূন্যে দেহের ভারসাম্যের পরীক্ষা দিতে হয় না। অবশ্য আইস ড্যান্সিং-এর খেলোয়াড়রা কতকগুলো কলাকৌশল করে, যেগুলো ফিগার স্কেটিং-এ করে না। এখানেও রাশিয়া সবচেয়ে

ভাল করেছে, নাতালিয়া বেস্টেমিয়ানোভা আর আন্দ্রেই বুকিন প্রথম হয়েছে।

পদক বিতরণের সময় অনেক খেলোয়াড়দেরই আবেগে এবং আনন্দে চোখ থেকে জল বেরিয়ে আসতে দেখেছি। সামগ্রিক ফলাফলে রাশিয়া ২৯টি পদক পেয়ে শীর্ষস্থানে ছিল। তার মধ্যে ১১টি সোনা, ৯টি রুপো এবং ৯টি ব্রোঞ্জ। পূর্ব জার্মানীও শীত-অলিম্পিক-এ অনেক দক্ষতার প্রমাণ দিয়েছে, তারা ২৫টি পদক পেয়ে দ্বিতীয় স্থানে ছিল। তার মধ্যে ৯টি সোনা, ১০টি রুপো এবং ৬টি ব্রোঞ্জ। সুইজারল্যাণ্ড ১৫টি পদক পেয়ে তৃতীয় হয়েছে। তারা সব রকমের পদক পাঁচটি করে পেয়েছে। ব্যক্তিগত কৃতিত্বে নেদারল্যাণ্ডের ইভনে ভ্যান গেনিপ মেয়েদের স্পীড স্কেটিং-এ তিনটি সোনার পদক পেয়ে শীর্ষে আছে। সব ফলাফল দেখে বোঝা গেছে যে শীত অলিম্পিক-এর প্রতিযোগিতায় ইউরোপের দেশগুলিই অন্যান্য দেশগুলির তুলনায় সর্বশ্রেষ্ঠ।

অলিম্পিকের শেষ সন্ধ্যায় (২৮শে ফেব্রুয়ারী) একটি সৌন্দর্য্যমূলক ফিগার স্কেটিং প্রদর্শনী 'স্যাডল্‌ডোম' স্টেডিয়ামে হল। ফিগার স্কেটিং আর আইস ড্যান্সিং-এ যারা পদক পেয়েছে, তারাই শুধু স্কেট করল। কোন বিচারক ছিল না, কোন প্রতিযোগিতা ছিল না। দর্শকরা এই অনুষ্ঠান দেখে মুগ্ধ হল। তার পরে 'ম্যাকমাহন' স্টেডিয়ামে শুরু হল সমাপ্তি অনুষ্ঠান। সেদিন সন্ধ্যায় অতীতের বিখ্যাত ফিগার স্কেটাররা দর্শকদের সামনে আরেকবার স্কেটিং-এর কলাকৌশল ও সৌন্দর্য দেখালেন।

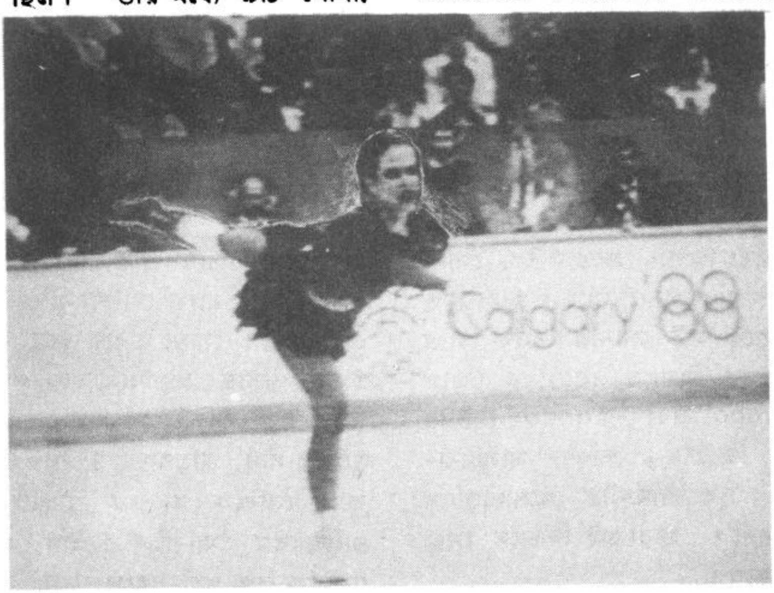

আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটির সভাপতি জুয়ান অ্যানটোনিয়ো সামারাঞ্চ সমাপ্তি ভাষণ পাঠ করলেন। ঘোষণা করা হল যে ১৯৯২ সালের শীত-অলিম্পিক-এর আসর ফ্রান্সের অ্যাল-বার্টভিল-এ অনুষ্ঠিত হবে। তারপরে অন্তিম মুহূর্তটি এল, অলিম্পিকের পতাকা নামিয়ে দেওয়া হল, খানিক পরে অলিম্পিক মশাল নিবিয়ে দেওয়া হল। বোঝা গেল যে ১৫শ শীত-অলিম্পিক-এর খেলা শেষ হল।

* হাতপাকাবার আসর কেবলমাত্র ১৭ বছরের কম-বয়স্ক গ্রাহক-গ্রাহিকাদের লেখা আর ছবি ছাপার জন্য।
* সন্দেশের পছন্দমত লেখা আর ছবি ছাপা হয়।
* কাগজের এক পিঠে পরিষ্কার করে লিখবে। নাম, গ্রাহক সংখ্যা ও বয়স দেবে।
* ছবি আঁকবে কেবল কালো কালিতে আর ছোট মাপে—৩" × ৪" চেয়ে বেশি যেন না হয়।

রাজা রাণী

ইন্দ্রনীল ভট্টাচার্য

৭০৫/৪ বছর ৭ মাস

গোলাপ হল ফুলের রানী,
আমরা তা সবাই জানি,
সিংহ হল পশুর রাজা
বল, তারে কে দেয় সাজা ?

ছড়া

অলি মিস্ত্রী

৮৯০/৪ বছর ৯ মাস

তুমি যা জানো
আমিও জানি ;
বই এ আছে
রচনা খানি।
পড়তে হলে—
বুদ্ধি চাই,
পড়াশুনো
কর ভাই ॥

ভাইয়ের দুষ্টুমি

স্মিতা বসু
৭ বছর ৯ মাস

'আমি একটা নতুন বই পেয়েছি! বাবা দিয়েছেন' বলে যখন আমার ভাই চেঁচিয়ে বাড়ি মাথায় করে ফেলল, আমিও ওকে ভেঙচিয়ে বললাম 'আমিও পেয়েছি,' অথচ আমি আসলে কিছু পাইনি।'

আমার বাবা এসে বললেন, 'মুমুন, পড়তে চল, সাড়ে সাতটা বাজে।' কাজেই বাবার পিছু পিছু যেতে হল।

বসে পড়ছি, হঠাৎ আমার ভাই এসে বলল, 'দেখবি বইটা?' আমি রেগে গিয়ে বললাম, 'বেরো ঘর থেকে! পরে দেখব।' সে বেচারা আস্তে আস্তে চলে গেল। পড়া শেষ করে উঠে অন্য ঘরে গেছি তখন ভাই এসে আমাকে একটা চড় মেরে নির্বিকার-ভাবে পড়ার ঘরে ঢুকে পাঁচ মিনিট পরে আবার বেরিয়ে এল। আমি কিছু বুঝতে না পেরে পড়ার ঘরে ঢুকে দেখলাম আমার কাগজপত্র সব ছেঁড়া। বাবার কাছে নালিশ করলাম, 'ভাই আমার কাগজগুলো ছিঁড়ে দিয়েছে।' বাবা তাকে এমনি ধমক দিলেন যে সে বেচারা তখনকার মত একটু দমে গেল, কিন্তু ওর দুষ্টুমি কমলো না।

একদিন মা কলে গেছেন আম বাইরে শুকোতে দিয়ে। আমি একটা কাক দেখে সেটা তাড়িয়ে দিতে গেছি, ফিরে এসে দেখি কয়েক টুকরো আম থালে নেই। বুঝতে বাকি রইল না যে সেটা ভাই-ই করেছে, কারণ সে টক আম খেতে খুব ভালবাসে। কিন্তু ওকে বকব কি? ও যে আম খেয়ে কোথায় লুকিয়েছে, ওকে আর পাওয়া গেল না।

সিঁড়ি বেয়ে বাড়িতে ঢুকছি, খাটের তলায় একটা হাসির শব্দ। দেখি ভাই আম খেতে খেতে হাসছে। আমি বললাম, 'বেরো। কোথা থেকে আম পেলি?' ততক্ষণে মা এসে গেছেন। মা ওকে জোর করে বার করলেন আর এমনি ধমকে দিলেন যে সেদিনের মত তার দুষ্টুমি শেষ। কিন্তু সারাজীবনের মত না। পরদিন থেকে তার দুষ্টুমি আবার বেড়ে চলল!

হিজি বিজি

কৌশিক ঘোষ
৮৭৭/১৬ বছর ৫ মাস

চুপি চুপি বলি শোনো
তোমাদের কানে—
বলব যা, সব বাজে
নেই তার মানে।
মানে যদি পেতে চাও
তাহলেতে শোনো,
এক থেকে একে বারে
এক কোটি গোনো।
গোনা শেষে হেসে হেসে
বিশ ক্রোশ হেঁটে,
জল দিয়ে গিলে খাবে
সিংহের মেটে।
সব শেষে চোখ বুঁজে
কান দুটো ধরে—
হাঁটু গেড়ে গান গাবে
খুব জোরে জোরে।
এসবের শেষে যদি
মানে নাই বোঝো,
তাহলে আবার সেই
শুরু থেকে খোঁজো॥

৮৬২ অমিতকুমার বাগচী—১১ বছর

শীত এলো

জ্যোতির্ময় দালাল

৪০২/১০ বছর

শীত এলো ভাই
কাজ কিছু নাই !
মুড়ি দিয়ে কম্বল—
শুয়ে থাকা চাই !
শীত এলো ভাই !—

শীত এলো ভাই
কষে গান গাই !
উনানের পাশে গিয়ে
আগুন পোহাই !
শীত এলো ভাই !—

শীত এলো ভাই
কোনো কথা নাই !
নলেনের সন্দেশ,
পিঠে-পুলি খাই ॥
শীত এলো ভাই !—

ফুলের পোকা

শমীক মুখার্জী

৮৫৬/৭ বছর

কাল ছিল কুঁড়ি গাছে
আজ ফুলে ভরা আছে।
আমি তো দেখিনি তাকে
ফুলেতে ঘুমিয়ে থাকে।
ফুলেতেই জেগে ওঠে
যবে ফুল গাছে ফোটে।
কি করে যে থাকে তারা
ফুলে তো যায় না মারা !
ফুলেতেই ওঠা বসা
ফুলের মধু খেয়ে খাসা
ফুলেতে খাবার আছে
থাকে ওরা ফুলের মাঝে।

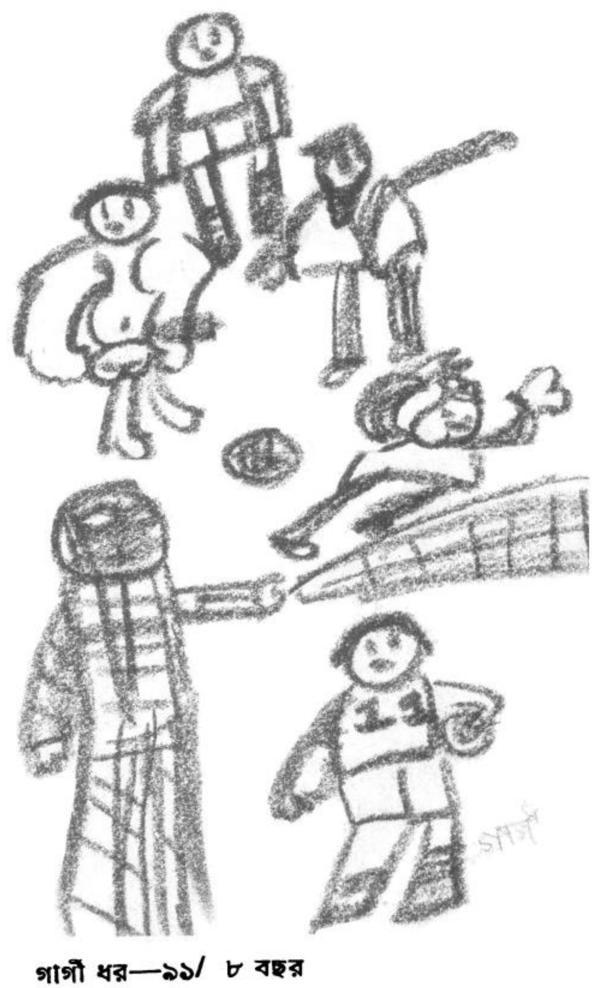

গার্গী ধর—৯১/ ৮ বছর

পদ্মডোবার ব্যাং দাদু

সঞ্চিতা বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৩৯০/ ১২ বছর ৮ মাস

ব্যাং দাদু ব'সে রোদ পোহাচ্ছিলেন। গুগলিগুলো ভারি কেমন যেন হয়ে যাচ্ছে দিনকে দিন। রাস্তায় দাঁড়িয়ে গুলতানী করে। এদিকে কাদাখোঁচা এলেই তো মরল। সেদিকে হুঁশ নেই! বছর কয়েক হ'ল অবসর নিয়েছেন। তবে লাফালে আজও জোয়ানদেরও ছাড়িয়ে যান। ছেলেটিও পদ্মডোবার বিখ্যাত লাফাড়ু; বাপকা বেটা! নাতি-নাতনীরা ধরেছে আধুনিক ধারা। বিলেতি স্কুল ছাড়া কেউ পড়েই না আজকাল, তায় এরা তো সেন্ট ফ্রগ.স, স্নেল পয়েন্ট স্কুলের ছাত্র-ছাত্রী। বড় নাতিটা সাইকেল ছাড়া বেরোয় না। আবার বন্ধুদের নিয়ে ক্লাব খুলেছে, বৈজ্ঞানিক উপায়ে পাঁক প্রস্তত নিয়ে গবেষণার জন্য। নাতনীটার কচুপাতার ব্যাগি, মাথায় মার্শগ্রাস তোলা, তাই নিয়েই থাকে সে। বৃষ্টি নামার গানটান শেখে না; 'ওসব তো এদেশী!' তার চাই পপ্ সুরে 'আয় বৃষ্টি।' এ কালের ছেলেমেয়ে বলে কথা!

সামনে ছোটো নাতিটা সুর ক'রে পড়ছে। হঠাৎ ব'লে উঠল 'দাদু, এই ভূগোলে জম্বুদ্বীপটা কোথায় গো?' সে আবার কি! বই-টা খুঁজলেন দাদু; পেলেন না এখন উপায়?

হঠাৎ হাওয়া উঠল। পাতা উড়ে উড়ে পড়তে লাগল দাদুর গায়ে। নিমগাছে বসা কাকেশ্বর চেঁচিয়ে উঠলেন 'ঘুরে দেখো, উড়ে দেখো, শিশিরের সুরে দেখো, ছ মাসের ট্র্যুরে দেখো,'……অতএব দাদু নাতিকে বললেন, 'নাঃ দেখেই আসি দ্বীপটা কোথায়। যদ্দুর বোধ হয়—রায়দীঘিতে, শিগ্‌গিরই ফিরছি।' পায়ে জুতো গলিয়ে, ধুতির কোঁচা গুছিয়ে, ব্যাং দাদু শেষে 'দুগ্‌গা' বলে যাত্রা করলেন।

দাদু দেখেন, মাঠে ফসলের গোড়াগুলো দাঁড়িয়ে আছে, মেঠো ইঁদুর শস্য ঘরে তুলছে। তিনি ভারিক্কী চালে এগিয়ে চললেন। বড় মাঠে বোধহয় দুপেয়েরা বনভোজন করেছিল। কমলা লেবুর খোসা পড়ে আছে কয়েকটা। হুঁঃ! ভারি তো ফল! খেতো যদি মশা তো বুঝতো। এঃ, একটা ষাঁড় ঘাস খাচ্ছে। পথ বন্ধ। পাশে একটা বাছুর বসে ঢুলছে। ব্যাং দাদু চশমাটা ট্যাঁকে গুঁজলেন, ধুতি গুটিয়ে এক লাফে বাছুর টপ্‌কে গেলেন ওপারে; সে জাগার আগেই তিন লাফে আরও দূরে। ওদিকে কতগুলো ইঁটের বাড়ি। ওতে নিশ্চয় প্রচুর মাছি! ঢুকবেন নাকি, ভাবলেন ব্যাং দাদু। নাঃ। আগে জম্বুদ্বীপ তো চাই! চলেছেন তো চলেইছেন। পথে জন প্রাণী নেই। বাড়িগুলোর সামনে রোদে বসা দুপেয়ে দানবেরা অবশ্য ধর্তব্যের মধ্যে নয়। অবশেষে রায়দীঘি। নাঃ।

ব্যাং দাদু ভাল করে চশমা এঁটে পাড়ে দাঁড়ালেন। কোনো দ্বীপ তো নেই! তবে? না, জম্বুদ্বীপ বের না করে দাদু ছাড়ছেন না। আপনমনে বলেন, 'তবে কোনদিকে যাই? উত্তরে?' উপর থেকে আওয়াজ এল, 'ওদিকে যাবেন না, গোখরোল্যাণ্ড!' 'ম্যাঁ! কে? কে?' 'আমি শ্রী শালিক, দাদু।' দাদু সামলে উঠলেন। 'তা বেশ, বেশ বাছা। তবে দক্ষিণই বা কি দোষ করল?' 'ওদিকে সশস্ত্র বাঘের খপপরে পড়ে কি প্রাণটি খোয়াবেন?' 'বাঘে আমার কাজ নেই

বাপু। আমি চলি বরং পশ্চিমে।' শালিক ধীরস্থির ভাবে বলেন, 'ভুলেও ভাববেন না ওদিক নিরাপদ অহিস্তান থেকে পালান।' 'নাঃ, তাহ'লে পুবই ভালো।' শালিক ব্যস্ত হয়ে উঠলেন 'করেন কি? গেলেই আড়াই প্যাঁচে জবাই। তাছাড়া চীনে বেচেও দিতে পারে। ওরা আপনাদের বড়ই ভালবাসে কিনা! মানে—খাদ্য হিসাবে।' ব্যাং দাদু বসে পড়লেন ধুপ্ করে। 'উঃ, কি ঝামেলার জম্বুদ্বীপ রে বাবা!'

শালিক সব শুনে হেসে ফেললেন; 'দাদু, দাঁড়ান, আমি এখনি ১০নং ভল্যুম দেখে বলছি। ১০নং উই—দাদু ক্রমে শুনলেন, কিছু উই বিশ্বকোষ খেয়ে ফেলায় শালিক মামলা করে তাদের বইয়ের মতো ব্যবহার করার অধিকার পেয়েছেন। 'বইগুলো শুধু সাজানো ছিল, দাদু। এদিনে দরকার পড়লো।' উইটার কাছ থেকে কি সব শুনে শালিক মুচকি হেসে বললেন, 'দাদু, এ বলছে, জম্বুদ্বীপ হ'ল প্রাচীন ভারত। অর্থাৎ আমি, আপনি, রায়দীঘি, পদ্মডোবা যেখানে।'

ব্যাং দাদু ধীরে সুস্থে বাড়ি ফিরলেন। জম্বুদ্বীপ পাওয়া গেছে। এ জায়গাটা আবার তার মধ্যে সবচেয়ে নিরাপদ! যাক তিনি দিনদিন হাসি খুশি হচ্ছেন। এমন কি গানও গান। 'সকল দেশের রাণী সে যে, গ্যাঙর ঘ্যাং গ্যাং'......। নাতিরা বলে, 'দাদু, কি করছ? বড়দিনে বৃষ্টি নামাবে নাকি?' ব্যাং দাদু মুচকি হেসে চুপ ক'রে যান। বকজ্যাঠা মাছ ধরেন আর ধ্যান করেন। পদ্মডোবা সকালের রোদে ঝিলমিল করে।

দোটানা

সুচন্দ্রিমা ব্যানার্জী

২৯১০/১১ বছর

পথের পাঁচালী পড়ে শুয়ে শুয়ে ভাবি
চলে যাব নিশ্চিন্দিপুর গ্রামে
(যথা) ঝিঁ ঝিঁ-ডাকা, তারা-ঝিকমিক রাতে
মাটির প্রদীপ জ্বলে ধামে ধামে।
সকালবেলার সোনালী ফিকে রোদ
শ্যাওলাধারা পাঁচিলের গায়ে পড়ে।
বুনো ফুল আর নেবুর গন্ধ আসে
ভেঙে পড়া গ্রাম্য মাটির ঘরে
ছায়াগাঢ় বিকেলে রাখালছেলে
গান গেয়ে যায় মেঠো পথের বাঁকে।
নদীর ধারে কলমীলতার ঝোপে
কোথায় যেন গাংশালিকেরা ডাকে।

কল্পবিজ্ঞানের গল্প পড়ে আবার
চলে যাই দ্বাবিংশ শতাব্দীতে।
যেথা বিজ্ঞানের উপহারের ছড়াছড়ি
রোবটরাই পরীক্ষা করে ল্যাবরেটারিতে।
লোকে জলখাবারের সময়, যন্ত্র দিয়ে
সিনথেটিক পকৌড়া বানায় কিচেনে!
ছোট্ট খোকা পা ছড়িয়ে বসে
হিজিবিজি আঁকে কম্পিউটার স্ক্রিনে!
গ্রাম্য প্রকৃতি বড়ই আমায় টানে
বিজ্ঞানেরও ডাক শুনি কান পেতে;
দোটানার মাঝে পড়ে আমি
শুয়ে থাকি একলা ঘরের খাটেতে ॥

পাঁচটা সত্যি শব্দ

সংঘমুক্তা ধর

৯১/১০ বছর

'আন্টি, ভেতরে আসতে পারি?'

'কে? ও! ভেতরে এসো, শুভ।'

ভেতরে ঢুকল শুভ। পিঠের মাঝারি সাইজের ব্যাগটা টেবিলে রাখতে রাখতে শুভ বলল—'আজ খুব দেরি করে ফেললাম।' ওর টিউটর, শুভর ভাষায় আন্টি বা রীতা-আন্টি, কড়া চোখে ও বিরক্ত মুখে ওকে নিরীক্ষণ করেছিলেন। আজও সেই শুভ ৮½টার জায়গায় ৯.১৫টায় এসেছে। অসহ্য! মাঝে মাঝে মনে হয় শুভকে আর পড়াবেন না। তখনই মনে পড়ে শুভ যে তার (শুভর) স্কুলের ফার্স্ট বয়। শুভ এই রকমই, ছাড়তে গেলেও মুশকিল, রাখতে গেলেও মুশকিল। দেরি করাটাই ওর একমাত্র দোষ নয়, মিথ্যে কথা বলা ওর দ্বিতীয় দোষ। এটা একদিক দিয়ে ওর পক্ষে ভাল, কারণ, স্কুলে কোন দোষ করলে ও এমন বানিয়ে বলে, এবং সেই গল্পে এমন অকাট্য অ্যালিবাই থাকে, টিচাররা কিছুতেই সেটা ফেলতে পারেন না দোষের বোঝা ও-র ঘাড়ে চাপে না।

যথাস্থানে ফিরে আসি। শুভর কথায় আন্টি গম্ভীর গলায় বললেন—'হুম্। সে তো দেখতেই পাচ্ছি। কিন্তু কেন? আজ এত দেরী কেন তোমার শুভাশিস?'

(রাগ হলে ছাত্রকে রীতা পুরো নাম ধরে ডাকেন)

'কী বলব আন্টি, আজ একেবারে বিঘ্নের পর বিঘ্ন।'

কাল থেকে আমার অ্যালার্ম ক্লকটা গোলমাল করছে। মিনিটের কাঁটা ঘণ্টা আর ঘণ্টার কাঁটা মিনিট দেখাচ্ছে। ঘড়িতো সারাতে দিলুম, এখন সকালে উঠে টাইম না জেনে আপনার ক্লাসে আসতে গেলে হয় খুব দেরি হবে, নয় তাড়াতাড়ি হবে। তাই আমি সকালে উঠেই টেলিফোনে টাইম জানতে বসে পড়লাম। বহুক্ষণ পরেও যখন লাইন পেলাম না, তখন আমি উঠে জামা-পোশাক পরে কিছু খেয়ে ব্যাগ নিয়ে দৌড়াতে দৌড়াতে সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে সিঁড়ির নীচে একপা ফেলতেই দড়াম্ করে পা হড়কে পড়ে যেতে যেতে সামলে নিলুম। আসলে আমার মনেই ছিল না, পরশু থেকে এক তলাটা রং করা শুরু হয়েছে। তার কিছুটা রঙ মেঝেতে পড়েছে, তাতেই আমি পা হড়কে পড়ে যাচ্ছিলাম। যাহোক, আমি ত তক্খুনি একেবারে তিনটে করে সিঁড়ি টপকে ওপরে উঠে জানলা গলে ড্রেন পাইপ বেয়ে ছাদে উঠে পড়লাম।'

'নীচে নামলে না?'

'না কারণ, ছাদটা, টাবলু, মানে আমাদের প্রতিবেশীর ছেলে, ওদের বাড়ি ঘেঁষা একেবারে। আমি ছাদ থেকে লাফিয়ে ওদের ছাদে পড়ে ওদের সিঁড়ি দিয়ে নেমে সোজা রাস্তায়। কিন্তু, রাস্তায় প্রচণ্ড ট্রাফিক-জ্যাম। কী ব্যাপার? মনে হল, একটা ব্যাণ্ড-পার্টি চলেছে। মিনিট-কুড়ি চেয়ে থাকার পর বুঝলাম, তা নয়। এটা একটা মিছিল। তাই কি? নাঃ। মিছিলও তো নয়! মিনিট-৪৫ চেয়ে থাকার পর বুঝলাম এটা দাঙ্গা হচ্ছে। দাঙ্গা! গাড়িগুলোও দেখলাম সব লেজ গুটিয়ে ভেগেছে। তার মানে আমি একা…বাবা গো! আমি কী ভাগ্যবান। এতক্ষণ দাঁড়িয়ে আছি, একটা গুলি যে গায়ে লাগেনি, এ তো আমার ঠাকুরদার মেশোমশায়ের পিসেমশাইয়ের

বাপের দাদামশায়ের ভাগ্যি! ওরে বাবা রে! এক লাফে আমি টাবলুদের বাড়ির পিছন দিকে গিয়ে পড়লাম। তারপরে সব একটু শান্ত মনে হল ভয়ে ভয়ে বেরিয়ে চারদিক দেখে নিয়েই একদম ওলিম্পিক-এর দৌড়্ দৌড়ে বাড়িতে এলাম।' থামল শুভ।

এবার রীতা দেবীর পালা। বললেন—'খোলাখুলিভাবে বল তো শুভ, এতক্ষণ আমায় যা যা বললে তার মধ্যে একটা শব্দও কি সত্যি?

'কেন নয়? সব না হতে পারে, অ্যাটলিস্ট পাঁচটা শব্দ অবশ্যই সত্যি।'

'সেই পাঁচটা শব্দ বল দেখি আমাকে।'

'অবশ্যই বলব। সেটা হল—আজ খুব দেরি করে ফেললাম।'

[The Latecomer'-এর ছায়ায়]

স্বপ্ন

বাসবদত্তা ধর

৯১ ৬ বছর

আমি কাল রাত্রে স্বপ্ন দেখেছিলাম। আমি আর আমার মা রাস্তায় যাচ্ছিলাম। তখন আমি শুনতে পেলাম মেঘ গুর্ গুর্ আর বাতাস বইছে। রাস্তা থেকেই শোনা যাচ্ছে। আমি তখন ওখানে গেলাম। দেখলাম বৃষ্টি পড়ছে। তখন আমি মায়ের কাছে চলে এলাম। আবার গেলাম তখনও বৃষ্টি হচ্ছে। বৃষ্টি থেকে বন্যা হয়ে ঘর বাড়ি সব ডুবে গেছে। যখন জল সব রাস্তার ভিতর ঢুকে গেল, তখন কত পাখী এল। ৫টি টিয়া, ১০টি শালিক, ৪টি ফিঙে পাখী এল। তারপর এসে মাকে সব কথা বললাম।

প্রবাসী বন্ধুর চিঠি

অনির্বাণ চৌধুরী / ১৭৪২

বন্ধুবর শ্রীমান বিশ্বজিৎ সমীপেষু,
বোম্বায়েতে বসে আমার মন যে চলে উড়ে,
তেপান্তরের মাঠ পেরিয়ে অনেক অনেক দূরে,
আমার আপন স্বপ্নে পাওয়া রূপকথারই দেশে,
নীল আকাশের রামধনু রঙ সবুজ মাঠে মেশে,
স্বপ্নে দেখা সেই দেশটাই শান্তিনিকেতন।
সেইখানকার কথা ভুলতে পারি কি কখন?
তোদের কথা সকল সময় আমার মনে জাগে
চিঠি তোদের পাই না বলে মনটা খারাপ লাগে।
বসে বসে ভাবতে অনেক কথা পড়ে মনে
বাদল দিনে সবাই বসে হোস্টেলের এক কোণে,
বসে খেলি লুডো, দাবা, পড়ি গল্পের বই,
কখন যে হয় বাজের আওয়াজ, কানটি পেতে রই।
মনে পড়ে ক্রিকেট খেলায় হয় জিত নয় হার,
সেই সঙ্গে মনে পড়ে অমিতাভদার মার,
আদরও তাঁর মনে পড়ে মৌ-এর কথাও ভাই,
ছোট্ট মিষ্টি বোনটি মোদের, তুলনা তার নাই।
'পুরান সেই দিনের কথা ভুলব কিরে হায়
চোখের দেখা প্রাণের কথা সেকি ভোলা যায়।'
অন্যরা সব চুপটি কেন? লিখতে বলিস পত্র
আজ এখানেই শেষ করি ভাই ভীষণ তাড়া অত্র
আমার তরফ থেকে তোদের জানাই ভালবাসা,
সুখে থেকে ভাল থেকো এইটুকু মোর আশা।
পুনশ্চ:
ইন্দ্রজিতকে (সপ্তম শ্রেণী) মনে করাস
কালো চিতার কথা।
শেষ হলো না বলে মনে রইল আমার ব্যথা।

ভালবাসি

ঐন্দ্রিলা ভট্টাচার্য্য

৭০৫/৯ বছর ৬ মাস

ভালবাসি লিখতে পড়তে
নানা জিনিস জানতে।
ভালবাসি খেলতে নাচতে
রং দিয়ে আঁকতে॥

ভালবাসি গান করতে
হারমোনিয়াম বাজিয়ে।
ভালবাসি ফুল দিয়ে
ঘর রাখতে সাজিয়ে॥

ভালবাসি লুচি-পরটা
নানা জিনিস খেতে।
ভালবাসি মার সাথে
হাত ধরে যেতে।
ভালবাসি মাসি পিসী মামী আর মামাকে
সবচেয়ে ভালবাসি মাকে আর বাবাকে॥

দেওয়ালী

উন্মগ্ন পয়ড়া

৭০২/৮ বছর

বল্‌লাম কাকুকে দেওয়ালী'ত এসে গেল
বানাতে হবে যে বাজি, মশলা কিনে ফেল।
মেলাই মশলা কিনে বানালাম বাজি—
ফুল্‌ঝুরি তুব্‌ড়ি কত কারসাজি।

দেওয়ালীর দিনে সাঁঝের বেলায়
মেতে উঠি মোরা সব বাজির খেলায়,
দোদোমার আওয়াজ দুম্‌দাম্‌ ফট্‌
উড়ালাম রকেট্‌ বোমা সুঁ-ই-ই সট্‌।

ফুলঝুরি জ্বলে যেন ঝক্‌মকে তারা,
তুবড়ির রাঙা আলো আগুন ফোয়ারা।

দেওয়ালী তো শেষ হ'ল
এবার পড়াশোনা
এই কাজে ফাঁকি দিলে
একদম চলে না॥

স্বাধীনতা

শুভায়ন বসু

৫৩৫/১৪ বছর

বনের পাখি স্বাধীন
গায়যে স্বাধীন সুরে
খাঁচার পাখি পরের অধীন
চায় যেতে সে উড়ে।

কিন্তু যে তার পায়ে বেড়ী
দেখেছে বারবার,
দুঃখে ক্লিষ্ট এদের জীবন
ক'জন বোঝে আর?

মন চলে যায় সুদূর পথে
যেথায় প্রাণের রেশ,
সে সব কথা স্মৃতিই শুধু
এখন বন্দী বেশ।
খাঁচার গণ্ডি ছাড়িয়ে গিয়ে
স্বাধীনতায় উড়তে চায়,
ইচ্ছে যে তার মলিন হয়ে
এসেই কাছে হারিয়ে যায়।

হীরুদার কবিতা

অনির্বাণ মিত্র

৩৩৭৫/১৪ বছর

আমার এক পিসতুতো দাদা আছে, নাম হীরুদা। ভাল নাম সূর্যকান্ত, যদিও সে নামে কাউকে হীরুদাকে ডাকতে শুনিনি। এই দাদাটি দারুণ মজার। নানান উদ্ভট উদ্ভট কাণ্ড করে আর মজার গল্প বলে। গল্পগুলো যদিও একটাও সত্যি বলে মনে হয় না।

সেদিন হীরুদা সকালবেলায় আমাদের বাড়ি এলো। দুপুরবেলা খাওয়া দাওয়ার পর আমি পটলা আর বোঁচা তিনজনে হারুদার ঘরে গেলাম কেবলমাত্র গল্পের লোভে। আমরা যেতেই হীরুদা বললে 'আয় বোস সব।' আমরা বসলাম। পটলা হঠাৎ বললে—'হীরুদা একটা গল্প বলো।'

হীরুদা হাই তুলতে তুলতে বললে—'গল্প আর কি শুনবি? তার চেয়ে আমার জীবনেরই একটা সত্য ঘটনা শোন্।' একটু থেমে হীরুদা শুরু করলে—'তোরা বোধহয় জানিস না যে আমি অনেকদিন ধরেই কবিতা লিখি? যাইহোক—আগের বছর ডিসেম্বর মাসে একখানা কবিতা লিখলাম। দারুণ হয়েছিল বুঝ্লি! আমার দৃঢ় বিশ্বাস হল যে কোন পত্রিকা এটা লুফে নেবে। তো গেলুম এক পত্রিকার অফিসে। লেখাটা রেখে দিয়ে এলুম। চারদিন বাদে গেছি। ওমা! সম্পাদক বললে—'উহুঁ' আপনার কবিতা মনোনীত হয়নি।' আমি বললুম—'তবে লেখাটা ফেরৎ দিন।' আমার কাছে লেখাটার কোনও কপি ছিল না। তো সে ব্যাটা কি বলে জানিস! বলে 'সেতো ঐ ওয়েস্ট-পেপার-বক্সে ফেলে দিয়েছি।' তো খোঁজ খোঁজ। বাক্সের কোথাও পাওয়া গেল না। আমি খুব চেঁচামেচি করাতে সেই সম্পাদক ঘাবড়ে গেলেন। তাড়াতাড়ি চাকরকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন। চাকরটি বললো—যাতেই। আজ সকালেই আমি বাক্সের সব কাগজ নর্দমায় ফেলে দিইচি।' কি আর করা যায়? নর্দমা থেকে তো আর কবিতার কাগজ খুঁজে আনা যাবে না, আর তাছাড়া সে জলের তোড়ে ততক্ষণে—। বাড়ি ফিরে এলুম। মনে খুব দুঃখ। আচ্ছা তোরা বলতো কোথায় যেতে পারে নর্দমা দিয়ে ভেসে ভেসে লেখাটা?'

আমি কিছু বলার আগেই বোঁচা ব্যঙ্গ করে বললে—'ভেসে ভেসে গঙ্গা থেকে ক্রমে বঙ্গোপসাগরে চলে যাবে।'—'ঠিক বলেছিস্।' বললো হীরুদা—'তারপর শোন্। নর্দমা দিয়ে ভেসে ভেসে নদী এবার নদী দিয়ে সাগরে চলে গেছে লেখাটা কোন্ এক বন্দরে বোধহয় এডেন, তার কাছে দিয়ে যাচ্ছে। সেইসময় হয়েছে কি, সেখানে এক আমেরিকান জাহাজ এসেছিল। জাহাজের ক্যাপ্টেন সেই কাগজটা জল থেকে তুলে নিয়ে জাহাজের সবাইকে দেখিয়েছে। খালাসীদের মধ্যে এক বাঙালী ছিল। সে ঐ লেখাটা ক্যাপ্টেনকে অনুবাদ করে শোনাতে ক্যাপ্টেন দা-রুণ খুশি। বলে এ কবিতা আমি আমাদের দেশের ম্যাগাজিনে ছাপবো।' তারপর কি হয়েছে জানিস? ঐ কবিতার অনুবাদ করিয়ে হুবহু ছাপিয়ে দিয়েছে ওখানকার এক পত্রিকায়। এই দ্যাখ—' বলে হীরুদা টেবিল থেকে একটা বিদেশী ম্যাগাজিন তুলে কয়েকটা পাতা উল্টে দেখাল—'এই দ্যাখ। আমরা ঝুঁকে পড়ে দেখলাম লেখা রয়েছে—'THE SUN AND THE MOON

by SUNEARRTO (সান্ইয়ারতো) ।' আমি বললুম 'এতো কে এক সানিয়ারতো-র লেখা। তোমার তো নয়।' হীরুদা হেসে বললে বললুম না সাহেব হুবহু অনুবাদ করেছো আমার ভাল নাম কি ?—সূর্যকান্ত তো ? SUN মানেকি ?—না সূর্য। EAR মানে কান। আর 'তো'র অনুবাদ না পেরে TO লিখে দিয়েছে। হল তো সূর্য-কান-তো ?' এই বলে হীরুদা ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

ঘরে বসে রইলুম আমরা তিনজন—আমি, পটলা আর বোঁচা। তিনজনেই তখন ভাবছি—কবিতা না লিখে গল্প লিখলে হীরুদা অনেক নাম করতে পারতো !!

রাখী

অভিষিক্তা আচার্য্য

২৮৩১/১২ বছর

আমার যে এক ভাই আছে তার
পুতুল পুতুল গড়ন,
চোখ দুটো তার স্বপন মাখা
মুখটা চাঁদের মতন।
আমার দিকে তাকায় যখন
দুষ্টু মিষ্টি হেসে,
কোলে তুলে আদর করি
বড়ই ভালবেসে।
মনে মনে ভেবেছিলাম
রাখী বাঁধার দিনে,
একটা রাখী করে দেব
নয়তো দেব কিনে।
রেশমি সুতো দিয়ে আমি
দু দুটো মাস ধরে,
ওর জন্যে করনু রাখী
অনেক যতন করে।
রাখীর দিনে সকালবেলা
শুদ্ধ বসন পরে,
রাখী খানি পরাই তারে
অনেক আদর করে।
নিমেষমাত্র কাটল শুধু
রাখী খানি ছিঁড়ে,
নয়টি মাসের ভাইখানি মোর
মুখেই দিল পুরে।

সন্দেশ

বিল্বদল রায়

২৩৫৫/১০ বছর ৬ মাস

নানান কবির গলপ ছড়ায় পাতায় পাতায় ভরা
এমনি যে পত্রিকা হয় জানতে কি তোমরা ?
নামটি তাহার সন্দেশ প্রথম করেন উপেন দাদা
লোভে পড়ে খেতে চেও না তবে লোকে বলবে হাঁদা।
তুমিও যদি চাও তোমার আঁকা লেখা দিও সেথা
বিচ্ছিরি বা বাজে হ'লে মোটেই ছাপা হবে না সেটা।
রাগটা তাতে করার ভাই কিছুই তো নেই
অনেক গুলো লেখা দিও সফল তবে হবেই।
বাংলার যত বড় লেখক সেথা লেখা দেয়
তাদের সংগে তোমার লেখা যদি বেছে নেয়
বল, তখন তোমার কতই না হবে আনন্দ
ছাপায় সেথায় ভাল লেখা, নেই তাতে গন্ধ।
লেখা দেওয়ার আগে গ্রাহক হয়ো কিন্তু ভাই
মেম্বার হ'তে বছরে চল্লিশ টাকা দেওয়া চাই।

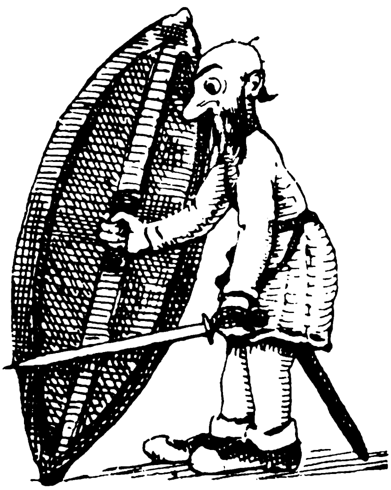

টাকার দাম উশুল করুন
সঠিক ওজন ও মাপ বুঝে নিন

* জিনিসপত্র কেনবার সময় সতর্ক থাকুন। কষ্টার্জিত টাকার ষোল আনা দাম বুঝে নেবার অধিকার আপনার আছে।

* ওজন ও পরিমাপের যন্ত্রাদি পরিদর্শক দ্বারা পরীক্ষিত ও শীলমোহরাঙ্কিত কিনা দেখে নিন।

* মেট্রিক ওজনে বা মাপে জিনিসপত্র কিনুন—অন্য মাপ বা ওজন ব্যবহার করা বেআইনি।

* বাজার দরের সঙ্গে যাচাই করে নেবার জন্য সোনার গয়না বা স্বর্ণনির্মিত সামগ্রী ১০ গ্রামের হিসেবে কিনুন।

* বিক্রেতাগণ ওজন ও মাপের যন্ত্রাদি বছরে একবার ওজন ও মাপ পরিদর্শক দ্বারা পরীক্ষা ও শীলমোহর করিয়ে নেবেন। সহজে দেখা যায় এমন জায়গায় দাঁড়িপাল্লা রাখুন—এতে ক্রেতাদের আস্থা বাড়বে।

* কাঠের দাঁড়িপাল্লা ব্যবহার করা শাস্তিযোগ্য অপরাধ। ওজন ও পরিমাপের দ্রব্যাদি অনুমোতি বিক্রেতার কাছ থেকে ক্যাশ মেমোর বিনিময়ে কিনবেন।

* ওজন ও পরিমাপ সম্বন্ধে যে কোন অভিযোগ স্থানীয় ইন্সপেকটর, কন্ট্রোলার অফ ওয়েটস্ অ্যাণ্ড মেজারস্ ৪৫, গণেশচন্দ্র অ্যাভেনিউ, কলকাতা-১৩ এই ঠিকানায় জানান।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

আই সি এ ৫৭৩৫/৮৮

আপনিই পারেন আগুন ঠেকাতে

অবজ্ঞা আর অবহেলা থেকে আগুন লাগতে পারে। কয়েকটি ব্যাপারে একটু সতর্ক হলেই কিন্তু বিপদ এড়ানো যায়।

* লক্ষ্য রাখবেন বাড়ির বিজলী তারে যেন কোনও খুঁত না থাকে। কাছাকাছি দমকল অফিসের টেলিফোন নম্বর জেনে রাখবেন।
* সিগারেট বা দেশলাই ফেলবার আগে নিভিয়ে দিন।
* বিছানায় ধূমপান করবেন না।
* অস্থায়ী মণ্ডপে বিদ্যুতের কাজে সতকর্তামূলক নিয়ম মেনে চলুন।
* পেট্রোল বা অন্য কোনও সহজদাহ্য পদার্থ বাড়িতে রাখবেন না।
* আগুন লাগলে আতঙ্কিত হবেন না। বিচলিত না হয়ে অবিলম্বে টেলিফোনে অথবা লোক পাঠিয়ে দমকলকে খবর দিন। ঘটনাস্থলের সঠিক অবস্থান এবং আপনার টেলিফোন নম্বর জানাতে ভুলবেন না।
* দমকল বাহিনীর প্রয়োজন ও পরামর্শমত তাদের সাহায্য করুন।
* আগুন থেকে জীবন ও সম্পত্তি রক্ষায় দমকল বাহিনীকে নির্বিঘ্নে তাঁদের কাজ করতে দিন।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

আই সি এ ৫৭৩৫/৮৮

নিউস্ক্রিপ্টের ছোটদের অসাধারণ বই

উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী—পৌরাণিক কাহিনী	১০·০০
পুণ্যলতা চক্রবর্তী ছেলেবেলার দিনগুলি	৮·০০
লীলা মজুমদার—উপেন্দ্রকিশোর	৮·০০
মাকু	৭·০০
আজগুবি	১০·০০
সত্যজিৎ রায়—প্রোফেসর শঙ্কু	২০·০০
একেই বলে শুটিং	১২·০০
শিশিরকুমার মজুমদার—দালাং মিশনের ঘণ্টা	৮·০০
তুফান দরিয়ার পরাণ মাঝি	১২·০০
নলিনী দাশ—হাতীঘিসার হানাবাড়ি	১২·০০
রানী রূপমতীর রহস্য	১০·০০
মঞ্জিল সেন—গঙ্গোত্রী রহস্য	৬·০০
জ্যোতিরিন্দ্রমোহন জোয়ার্দার অনূদিত	
স্যার আর্থার কোনান ডয়েল—ম্যারাকট ডীপ	১০·০০
রেবন্ত গোস্বামী—বাবলা ফুলের গন্ধে	১০·০০
নিরঞ্জন সিংহ—মহাকাল	১০·০০
প্রণব মুখোপাধ্যায়—নীল শ্যাওলার খোঁজে	৫·০০
বুড়ির ঝুড়ি	৫·০০
ভবানী প্রসাদ মজুমদার—মিঠে কড়া পশুর ছড়া	৫·০০
মিঠে কড়া খেলার ছড়া	২·০০
মিঠে কড়া ভূতের ছড়া	২·০০
নাম তাঁর সুকুমার	৪·০০
শিশির বিশ্বাস—বাঘবন্দী মন্তর	১০·০০
সেরা ভূতের গল্প সংকলন—অশরীরীর আসর	২৫·০০
সম্পাদনা : লীলা মজুমদার, নলিনী দাশ ও সত্যজিৎ রায়	
কমিক স্ট্রিপ—টোটোর অ্যাডভেঞ্চার	
গল্প—নলিনী দাশ, ছবি : প্রশান্ত	৪·০০
দানোর সন্ধানে	
গল্প : মঞ্জিল সেন, ছবি : সিদ্ধার্থ	৩·০০

নিউস্ক্রিপ্ট —এ ১৪, কলেজ স্ট্রিট মার্কেট, কলিকাতা-৭০০ ০০৭

সন্দেশের গ্রাহকেরা এখন নিউস্ক্রিপ্টের বই-এ ২৫% বিশেষ কমিশন পাচ্ছে

Regd.No. WB/SC-102 : SANDESH Fabruary Price 4·00

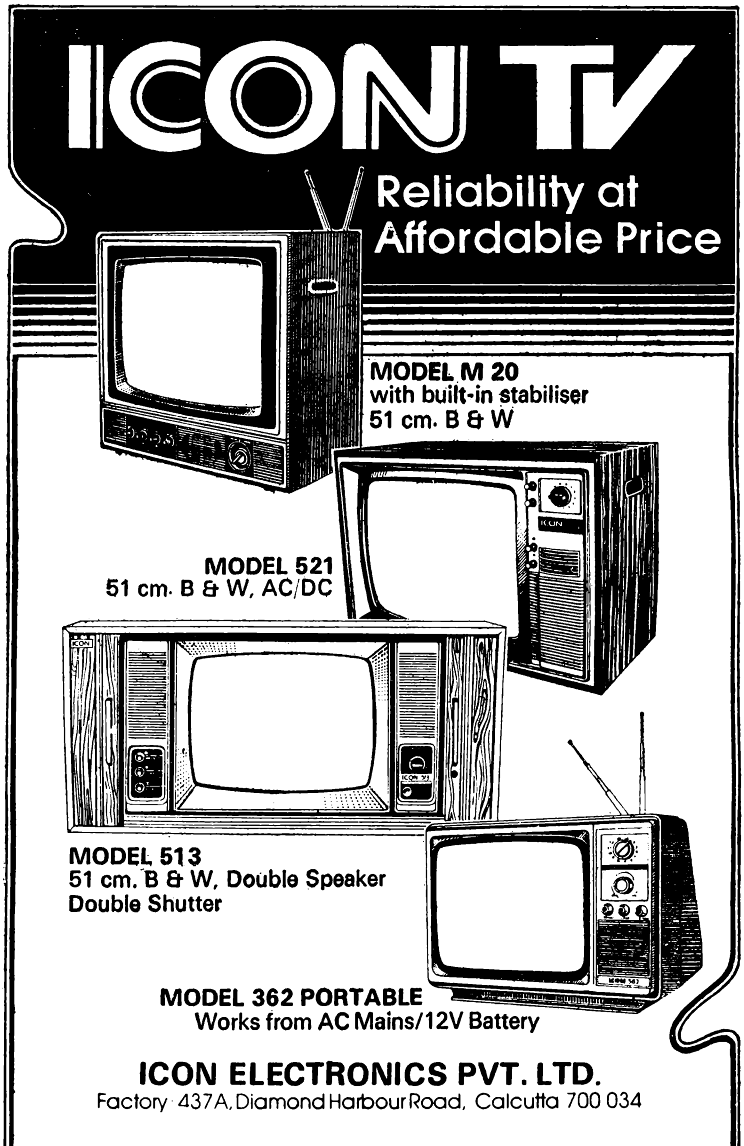

কালিকা প্রিন্টার্স এ্যাণ্ড বাইণ্ডার্স, ১০৯বি, কেশব চন্দ্র সেন ষ্ট্রীট, কলি-৯ দ্বারা
সন্দেশ কার্যালয়—১৭২ ৩ রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-২৯ হইতে
অশোকানন্দ দাশ কর্তৃক প্রকাশিত।